বীর সাধক বিবেকানন্দ

সুজিত কুমার নাগ

২৮/১, জাষ্টিস্ মন্মথ মুখার্জী রো. কলিকাতা-৯

আদিত্য প্রকাশালয়, ২৮।১ জাষ্টিস্ মন্মথ মুখার্জী রো, কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীহরিপদ বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত ও ঘোষ প্রিণ্টকো:— ৪, ফরডাইস্ লেন, কলিকাতা-১৪ হইতে শ্রীমতী সবিতা ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

যুগ থেকে যুগে, কাল থেকে কালে, যুগের প্রয়োজনে মহাপুরুষদের আবির্ভাব ঘটে। আমরা দেখেছি দেশে দেশে কালে কালে তার প্রকাশ। প্রসঙ্গত বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না এ পৃথিবীর চিরন্তন সত্য চন্দ্র সূর্য তারা, জল স্থল আকাশ মাটি, প্রকৃতির বিধানে যেমন ঠিকই থাকে, ঠিক তেমনিই মহাপুরুষদের পরম সত্য বাণী শাশ্বত ধ্রুবতারার মতন স্থির থাকে। যুগের প্রয়োজনে সেই মহাপুরুষের পরম আবির্ভাব সুন্দর রূপে প্রকাশিত হয় তাঁর কাজে চিন্তায় ও ধ্যানে। ঠিক তেমনি ভাবেই আমরা যুগের প্রয়োজনে পেয়েছি স্বামী বিবেকানন্দকে।

তিনি আমাদের ভারতবর্ষে সঙ্কীর্ণতা, দীনতা, অজ্ঞানতা ধর্মের ছুৎমার্গতা পরিত্যাগ করে পরাধীন ভারতের সমস্ত নিপীড়িত মানবের কল্যাণ কামনায় দেশের মানুষকে ডেকেছিলেন। তাঁর সেই ডাকে ছিল বজ্রের কঠোরতা, কুসুমের কোমলতা। তাঁর জীবন দিয়ে অনুভব করতে পেয়েছিলেন আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্বলতা, তাই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল—"ওঠ জাগো, তেমাদের মাতৃভূমি মহাবলি প্রার্থনা করছে।"

স্বামী বিবেকানন্দের সেই অমৃতময় বাণী আজ আমরা গ্রহণ করতে পেরেছি। ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন।

অতীতের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখতে পাই সেদিনের সেই সুন্দর পৃথিবীতে সাধক স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সাধনার দ্বারা এনেছিলেন এক বিরাট বিপ্লব।

বীর সাধক বিবেকানন্দের সেই অভয় বজ্রের কণ্ঠনিনাদ আজও প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে আমাদের কর্মে ও চিন্তায়, তাঁর বজ্রনিনাদে তিনি শুনিয়েছিলেন "হে ভারত ভুলিও না, তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের, ব্যক্তিগত সুখের জন্যে নহে, ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত।"

আজ স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের মধ্যে নেই তবুও তাঁর জ্যোতি দেহত্যাগের পরেও আকাশে বাতাসে স্ফুরিত হচ্ছে, এখনও তাঁর কণ্ঠবীণা হতে সুর ভেসে আসছে।

যদিও এ কথা সত্য বলে আমরা মেনে নেই, জগতের অশান্ত ঘূর্ণি আবর্তে এই ক্ষণিকের জীবন নিয়েই এসেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তবুও তাঁর সেই মহান জীবনের মাধ্যমেই তাঁর কর্মজীবন ছিল বিরাট ও বিচিত্র।

আজ তাঁকে স্মরণ করা প্রত্যেক ভারতবাসীর একান্ত প্রয়োজন। তাঁর শুভজন্ম শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে সমগ্র জাতির মিলিত প্রণতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানাই আমাদের প্রাণের প্রণাম। মহামানব, মহাবিস্ময় হিমালয়ের মত স্থির সেই জ্যোতির্ময় বীর সাধক বিবেকানন্দের তেজদীপ্ত বাণী আমাদের চলার পথের পাথেয় হোক।

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর সাধক বীর সাধক স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধনায় মহান আদর্শ আমাদের সম্মুখে রেখে গিয়েছেন। আজ তা জাতীয় জীবনের চেতনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। তাঁর চিন্তা ও চরিত্র মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে দেখা দিয়েছে। উৎস সন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই এত বড় বিরাট মহাপুরুষের আবির্ভাব কী করে সম্ভব হল, তখনই আমাদের তাঁর জীবনচরিত এগিয়ে যেতে গেলে, পিছিয়ে যেতে হবে আজ থেকে একশো বছর আগের কলকাতায়। তখনকার কলকাতার সেই সময়ের দিনগুলিকে

মিলিয়ে নিতে গেলে হয়ত আমরা ছায়াছবির মতন দেখতে পাব কয়েকটি ঘটনার ছিন্ন সূত্র। তবুও সবিনয়ে বলব স্বামী বিবেকানন্দের মতন মহপুরুষের জীবনী বা তাঁর আলোচনা লিখে শেষ করা যায় না। আমরা তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের ঘটনাগুলিকে পাঠকদের কাছে তুলে ধরবার জন্য এই গ্রন্থের অবতারণা করছি। বীর সাধক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ও তিরোভাব দুইই আমাদের কাছে অতীতের ঘটনা।

১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী। পৌষ সংক্রান্তির এক শুভ প্রভাতে কলিকাতা নগরীর এক গৃহ সেদিন মুখর হয়ে উঠল এক শিশুর আবির্ভাবে। মহিয়সী রমণী ভুবনেশ্বরীর কোলে বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর শুভ আবির্ভাবে আনন্দমুখর হয়ে উঠল দত্ত গৃহ। মঙ্গল-শঙ্খে ধ্বনিত হল চারিদিক। ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখ স্মরণীয় হয়ে রইল। সেদিন ছিল বাংলার ঘরে ঘরে পৌষ পার্বণের আনন্দোৎসব। যেন নবজাত এ শিশুর আবির্ভাব হল পৃথিবীর বুকে নতুন আশার আলো নিয়ে।

আমরা এবার এই দত্ত পরিবারের পারিবারিক ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে এখনও দেখতে পাই কলিকাতা নগরীর সিমুলিয়া অঞ্চলে গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীটের সেই দত্ত বাড়ী এখনও তার অতীত ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়েছে জীবন্ত হয়ে। একদা এই দত্ত বংশের ঐশ্বর্য ও খ্যাতি সারা বাংলা দেশের কাছে ছড়িয়ে ছিল। আর পরবর্তী যুগে স্বামী বিবেকানন্দের এই দত্ত বংশে জন্মগ্রহণ করার জন্যে চিরদিনের জন্য ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা রইল। দত্তপরিবারের পূর্বপুরুষদের ইতিহাসে দেখা গেছে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের বিখ্যাত আইনজীবি রামমোহন দত্ত যে প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন তা আজও স্বীকৃত। রামমোহনের পুত্র দুর্গাচরণ তখনকার কালে সংস্কৃত আর ফরাসী ভাষায় অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেছিলেন এবং তরুণ বয়সেই আইন ব্যবসা সুরু

করেন। কিন্তু আশ্চর্য চরিত্রের অধিকারী ছিলেন দুর্গাচরণ। ভোগ বিলাস, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির আকর্ষণ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। শুধু তাই নয় অবসর সময়ে দুর্গাচরণের একমাত্র কাজ ছিল ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করা আর সাধু ও সুধীবৃন্দের সাথে মেশা। যৌবনের সমস্ত আকর্ষণ উপেক্ষা করেই দুর্গাচরণ এগিয়ে গেলেন এক নতুন জগতের সন্ধানে। মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সেই সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে দুর্গাচরণ সমস্ত লোভ লালসাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। দুর্গাচরণ তাঁর বিবাহিতা পত্নী ও একমাত্র শিশুপুত্র গৃহে রেখে সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। কি বিচিত্র চরিত্র ছিল তাঁর। তবুও তাঁকে একবার আসতে হয়েছিল গৃহত্যাগের পরে বারো বছর পরে যখন তিনি স্বীয় জন্মস্থান দেখতে এসেছিলেন। সন্ন্যাসীদের নিয়মানুসারেই বারো বৎসর পরে তাঁকে আসতে হয়েছিল আর সেই সময়েই বালক পুত্র বিশ্বনাথকে তিনি দেখেছিলেন এবং প্রাণভরে আশীর্বাদ করে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর আর দুর্গাচরণকে কেউ দেখতে পায়নি। সন্ন্যাসীর পুত্র বিশ্বনাথ দত্তই বীর সাধক বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জনক।

আশ্চর্য আর বিচিত্র এই দত্ত পরিবার। বিশ্বনাথ দত্তও আইন ব্যবসা শুরু করেন। তিনি ছিলেন একাধারে পণ্ডিত ও প্রতিভাশালী পুরুষ। রামমোহন দত্তের ধারাকে তিনি বজায় রেখেছিলেন। বিশ্বনাথ দত্ত পারসী ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। কাব্য চর্চায় তাঁর প্রতিভাও ছিল অসাধারণ। হাফেজের কবিতা পাঠ করতেন। ইংরাজী সাহিত্য আর ইতিহাসের প্রতি তাঁর ছিল প্রবল ঝোঁক, যার ফলে বিশ্বনাথ দত্তকে গোঁড়া হিন্দুয়ানী হিসাবে কেউ দেখেনি। ধর্ম আর ঈশ্বর আছে কি নেই এই সব নিয়ে বিশ্বনাথ দত্ত কোন সময়েই চিন্তা করতেন না। তবুও বিশ্বনাথ ছিলেন স্বাধীনচেতা নির্ভীক পুরুষ। উদার, বন্ধুবৎসল হিসাবে তাঁর খ্যাতি

ছিল। তাঁর অনেক মক্কেল ছিল অভিজাত মুসলমান। বিশ্বনাথ লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করার ফলে বহু অভিজাত মুসলমান পরিবারের সাথে তিনি মিশেছিলেন। জীবনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সুন্দর এবং আদর্শরূপে সংসার ধর্ম পালন করা। আহারে বিহারে যদিও তিনি মুসলমানী আদবকায়দা অনুসরণ করতেন, কিন্তু ধর্ম বিষয়ে বাইবেল পাঠ করে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিশ্বনাথ দত্তের এই বৈচিত্র্যময় বিচিত্র জীবনের মধ্যে দিয়েও তাঁর ধর্মপত্নী ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন প্রাচীন আদর্শের মহিয়সী রমণী। স্বামী বিবেকানন্দের মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী বাংলা দেশের মহিয়সী প্রাতঃস্মরণীয় রমণীদের মধ্যে অন্যতমা ও অনন্যা হয়ে চিরদিনই নারী-সমাজের কাছে শ্রদ্ধার আসনে বিরাজ করবেন।

পুত্রাভাবে তাঁর অন্তর সংগোপনে কেঁদে উঠেছিল। তাই তিনি পুত্র কামনায় প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় শিব মন্দিরে প্রার্থনা সুরু করলেন। সরল ও সহজমতি ধর্মপ্রাণা রমণী ভুবনেশ্বরী তাঁর এই কামনা ও প্রার্থনা সমস্ত অন্তর দিয়ে শিবপূজায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। সত্যি সত্যি একদিন প্রসন্ন সকালে মহিয়সী রমণী ভুবনেশ্বরী দেবী শিবপূজান্তে ধ্যানস্থা হলেন। তিনি স্বপ্ন দেখলেন তাঁর কোলে আসছে বিশ্ববিজয়ী শিশু। যেন হিমালয়ের মত স্থির, মহাদেব স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে। আহা! কি অপূর্ব, স্বর্গীয় সে স্বপ্ন! ভুবনেশ্বরী দেবীর সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হল ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারীতে। এই শিশুই বিশ্বজয়ী বীর সাধক বিবেকানন্দ।

শিশু বড় হতে লাগল। বালকের চেহারার সংগে সন্ন্যাসী পিতামহের মিল দেখে অনেকে বললে এর নাম হোক দুর্গাদাস। নামকরণের সময় এসেছে। কিন্তু মায়ের মন সায় দেয় না। মাতা ভুবনেশ্বরী বললেন স্বপ্নে যাঁকে পেয়েছি সেই দেবাদিদেবের নাম অনুসারে বীরেশ্বর রাখা হোক। বীরেশ্বর থেকে সংক্ষেপে

এলো বিলে। আর শুভ অন্নপ্রাশনের সময় বালকের নাম রাখা হল নরেন্দ্রনাথ। আর এই নরেন্দ্রনাথ দত্তই হচ্ছেন আমাদের বিবেকানন্দ।

বালক নরেন্দ্রনাথ নিজের খেয়ালে চলত, আপন মনে কি যেন ভাবত। ছেলেবেলা থেকেই সাধুসন্ন্যাসীদের দেখলে নরেন্দ্র-নাথের মনে আনন্দের জোয়ার বইত। ছেলেবেলা থেকেই রামায়ণ আর মহাভারত শুনতে শুনতে তাঁর প্রায় সমস্ত মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। সেই বয়সে তাঁর সুললিত কণ্ঠে রামায়ণ মহাভারতের আবৃত্তি যে শুনত সেই মুগ্ধ হয়ে যেতো। বালক নরেন্দ্রনাথের চরিত্র ছিল এক বৈচিত্র্যময়। কখনো শান্ত, কখনো অশান্ত। অশান্ত নরেন্দ্রনাথ বয়স বাড়ার সংগে সংগে দুর্দান্ত দুষ্টু হয়েছিলেন। যার জন্য বাড়ীর সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো। মায়ের মনে সব সময়ই যেন একটা অজানা আশংকা। মা ভাবতেন কেমন করে এই দুর্দান্ত ছেলেকে শান্ত করা যায়? উপায় খুঁজে বার করেছিলেন জননী ভুবনেশ্বরী। কী উপায়? 'শিব শিব' বলে মাথায় কিছু জল ফেলে দিলেই অশান্ত নরেন্দ্রনাথ শান্ত হয়ে যেত।

একদিনের ঘটনা। নরেন্দ্রনাথ খেলাঘরে বসে ছিলেন। ছেলের দলকে সঙ্গে নিয়ে অঙ্গে ছাই মেখে ধ্যানে বসে গেলেন নরেন্দ্রনাথ। একমনে একাগ্রতার সঙ্গে ভাবসাগরে ডুবে গেছেন তিনি। অশান্ত বালকের মধ্যে একজন চোখ মেলতেই দেখতে পেলো একটি প্রকাণ্ড সর্প। আর যায় কোথা! চিৎকারে, ভয়ে সমস্ত বালকরা পালিয়ে গেল। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ, সে তখন আরেক জগতে। যেন সমস্ত জগতের সংগে তার সম্বন্ধ ছিন্ন হয়েছে। খবর পেয়েছে এক অজানা জগতের।

খবরটা ছড়িয়ে গেছে ইতিমধ্যে। বাড়ীর সবাই ছুটে এলো।

মা, বাবা সবাই। কিন্তু কী আশ্চর্য নরেন্দ্রনাথের দেহ স্পন্দনহীন। যেন ধ্যানে বসে আছেন ঋষিতনয়। আর সেই বিষধর সর্প তার ভীষণ ফণা বিস্তার করে এ অদ্ভুত ধ্যানের সাক্ষী স্বরূপ হয়ে রয়েছে। এ আশ্চর্য মধুর নয়নাভিরাম দৃশ্যে সকলের চোখে এক স্বর্গীয় দৃশ্যের অবতারণা ঘটল। তারপর সেই বিষধর সর্প তার ফণা গুটিয়ে সমলের সামনে অদৃশ্য হল। তারপর নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে চোখ মেললেন। চেয়ে দেখলেন সকলে ঘিরে রয়েছে। এতবড় সাধনার কথা শুনে বালক নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হয়ে বললেন, আমি তো এর কিছুই জানি না। আমি এক অপূর্ব আনন্দের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলাম।

কী আশ্চর্য আর অদ্ভুত সাধনা!

শুধু তাই নয়, তাঁর বাল্যকালের আরও বৈচিত্র্যময় সাধনা আমরা দেখতে পেয়েছি।

নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত গোঁড়া হিন্দু ছিলেন না। সর্বজাতির লোকের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রীতি ও মধুর সম্পর্ক। বিভিন্ন জাতির মক্কেলগণ আসতেন মামলা মোকদ্দমার জন্য। বাল্যকাল থেকেই নরেন্দ্রনাথ তাদের দেখে আসছে। বিশ্বনাথের জনৈক মুসলমান মক্কেল ছিল, যার দেশ পেশোয়ার। এই পেশোয়ারী মুসলমান নরেন্দ্রনাথকে খুব ভালবাসতেন। আর বালক নরেন্দ্রনাথও তাঁর কাছ থেকে পাঞ্জাব আর আফগানিস্থানের বিচিত্র ভ্রমণ কাহিনী শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতো! শুধু তাই নয় এই পেশোয়ারী মুসলমান, বালক নরেন্দ্রনাথকে ফল, সন্দেশ খাদ্য দিত, আর বালক নরেন্দ্রনাথ আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে তা নিত। নরেন্দ্র-নাথের এই আচরণে বাড়ীর সকলেই তাঁকে বকতো, বলতেন, "জাত গেলরে বিলে।" বালক নরেন্দ্রনাথের কৈশোর মনেও এই প্রশ্ন দেখা দিল। জাত কি? আর জাত কি করে যায়? তাঁর মনে জাতিভেদ একটা প্রবল সমস্যা দেখা দিল। নানান প্রশ্নে বালক

নরেন্দ্রনাথের অন্তরে সাড়া দিল। কেন এই ব্যবধান? কেন এই জাতি ভেদ? কেন? এই সব প্রশ্নের সমাধান কি করে সম্ভব?

বালক নরেন্দ্রনাথ এক বিচিত্র সমস্যার সামনে এলেন।

পিতা বিশ্বনাথ দত্তের বৈঠকখানায় অনেকগুলি রৌপ্য মণ্ডিত হুকা ছিল। বিভিন্ন জাতির মক্কেলরা আসত, তাদের জন্যেই এই রৌপ্যমণ্ডিত হুকার সমাবেশ।

বালক নরেন্দ্রনাথ বৈঠকখানায় এসে দেখলেন ঘরে কেউ নেই। মনের মধ্যে নানান প্রশ্ন। সহসা মনে সাহস সঞ্চার করে একের পর এক হুকাগুলি টানতে লাগলেন। কই আশ্চর্য তাঁর তো কিছু লাগছে না? তাঁর তো কোন জাত গেল না? তবে কি? সে তো ঠিকই আছে? পিতা নরেন্দ্রনাথকে দেখতে পেয়ে হাস্য সহকারে প্রশ্ন করলেন, কী করছিস রে বিলে?

আর নির্ভীক নরেন্দ্রনাথ তখনি জবাব দিলেন, আমি পরীক্ষা করছিলাম বাবা, জাতিভেদ কি? যদি জাতিভেদ না মানি তাহলে আমার কি হবে?

নরেন্দ্রনাথের এই উত্তরে পিতা বিশ্বনাথ দত্ত চিন্তিত মনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সেই সময়ের একটি ঘটনা। যখন তাঁর বয়স মাত্র ছয় বৎসর সেই বয়সেই খেলার সাথীদের সঙ্গে নিয়ে চড়কের মেলা দেখতে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে মহাদেবের অনেকগুলি মূর্তি কিনেছিলেন। ছেলের দলের মধ্যে একজন দল-হারা হয়ে ফুটপাথ থেকে সরে গিয়ে রাস্তায় নেমে গিয়েছিল। আর সেই সময় একটি দ্রুতগামী গাড়ি ছেলেটির সামনে এসে হাজির। ছেলেটি ত বিস্ময়ে হতবাক! রাস্তার লোকজন আসন্ন বিপদ দেখে চিৎকার সুরু করে দিয়েছে। আর নরেন্দ্রনাথ প্রবল সাহসের সঙ্গে দুর্জয় শক্তি নিয়ে দ্রুতবেগে প্রায় অশ্বপদতল থেকে ছেলেটিকে বার করলেন। এই দৃশ্য দেখে সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। পরে মাতা ভুবনেশ্বরী যখন এই সংবাদ শুনলেন, নরেন্দ্রনাথকে

আশীর্বাদ করে বললেন, 'সব সময়ই মানুষের মত কাজ কোর বাবা।'

আগের জীবনটুকু ছিল তাঁর মাধুর্যে আর সরলতার ভরা। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর সুরু হল তাঁর কলেজ জীবন।

এই জীবন সুরুর সঙ্গে সঙ্গে আমরা নরেন্দ্রনাথকে দেখতে পেয়েছি এক বিচিত্র জীবনের সংঘাতে। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে যুবক নরেন্দ্রনাথের বিচিত্র রহস্যময় জীবনের সূত্রপাত সুরু হল।

তরুণ প্রিয়দর্শন নরেন্দ্রনাথ ১৮৭৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হবার পর ১৮ বৎসর বয়সে কলেজে ভর্তি হলেন। ইতিমধ্যে পরীক্ষার জন্য তৈরী হয়ে গেলেও তাঁকে শারীরিক অসুস্থতার ফলে প্রেসিডেন্সী কলেজ ছেড়ে দিতে হল। কারণ ছিল তিন বৎসরের পাঠ একবৎসরে শেষ করতে গিয়ে যে পরিশ্রম করেছিলেন যার জন্য মানসিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল, তারপর ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলেই কলেজ ছাড়তে হল। তারপর জেনারেল এসেম্বলী ইনষ্টিটিউশনে যোগ দিলেন এবং সেখান থেকেই এফ. এ. পড়তে লাগলেন।

তরুণ ব্যক্তিত্বশালী নরেন্দ্রনাথ অতি সহজেই জয় করে নিলেন সকলের মন। কলেজে নরেন্দ্রনাথের অনেক বন্ধু ছিল। এই সময়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের মাধুর্যে সকলেই অবাক হয়ে যেত। দর্শন গ্রন্থ পাঠে নরেন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল প্রবল। দেখা গেছে এফ. এ. পরীক্ষার আগেই দর্শন শাস্ত্র ও বিবিধ শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পাঠে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। হিউম ও হারবার্ট স্পেন্সের দার্শনিক গ্রন্থে তাঁর জ্ঞানের পিপাসা মিটত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য জেনারেল এসেম্বলী কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়াম হেস্টি সাহেব নরেন্দ্রনাথকে বিশেষ স্নেহ করতেন এবং দর্শন শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতেন। আর নরেন্দ্রনাথের অনুসন্ধানী মনে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রবল বিক্ষোভ এসো হাজির হল!

আর মনের মধ্যে এক প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসতে লাগল নরেন্দ্রনাথের,. ঈশ্বর কি? ঈশ্বর কি কেউ দেখেছেন? যখনই কোন ধর্ম প্রচারক ধর্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে বক্তৃতা করতেন তখন নরেন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরের মধ্যে যে আলোড়ন আসত সেটাকে যাচাই করতেন। বলতেন, "মহাশয়, আপনি কী ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?" কিন্তু এর উত্তর কেউ দিতে পারে নি।

এই সত্যলাভের সন্ধানে ব্রাহ্ম সমাজে গেলেন। তরুণ নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যও হয়েছিলেন। কিন্তু এখানেও এসে তাঁর মন শান্ত হয় নি, দেখা গেছে ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেও মূলসত্য খোঁজার জন্য সত্যকারের পথ খুঁজতে লাগলেন।

কিন্তু সংশয় সন্দেহ তাঁর মনেই রইল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে ধ্যান করবার জন্য বলতেন। মহর্ষি বলতেন, ধ্যানেই তোমার শান্তি ও সত্যলাভ হবে। মহর্ষিকে নরেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা করতেন।

তখন নরেন্দ্রনাথ নিজেকে নির্জনতার মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। সুরু করলেন কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন। নরেন্দ্রনাথ নিজের বাড়ী ছেড়ে মাতামহের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে একটি নির্জন কক্ষে বাস করতে লাগলেন। তখন নরেন্দ্রনাথের এই অসাধরণ পরিবর্তন দেখে সবাই ভাবল হয়ত নরেন্দ্রনাধ পড়াশোনার জন্যই নিজ বাড়ীতে রইলেন না। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তখনও ঘোর ঘন অন্ধকারে। তাঁর মনে প্রশ্ন, যতই দিন গেল, সত্যকে তো খুঁজে পেলাম না। নরেন্দ্রনাথের মনে হলো এ জীবনে সত্য খুঁজে বার করতেই হবে। কে তাকে দেবে শান্তি?

সেই ঘন অন্ধকারের মধ্যে বুঝি বা আলো দেখা দিল।

কলিকাতাস্থ সিমলা পল্লীতে আনন্দের কলরোল। সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ীতে এসেছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব।

সেদিন ছিল ১৮৮০ সালের নভেম্বর মাস। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছেন তাই আনন্দোৎসবের আয়োজন। ঠাকুরকে গান শোনাতে হবে। কিন্তু কে শোনাবে? কেই বা সে? মনে পড়লো প্রতিবেশীদের মধ্যে একজনের। ছুটে গেল নরেন্দ্রনাথের কাছে। নিয়ে এলো তাঁকে।

সুকণ্ঠ গায়ক প্রিয়দর্শন নরেন্দ্রনাথকে দেখলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বার বার দেখলেন নরেন্দ্রনাথকে। আর যাবার সময় বলে গেলেন, "একবার আসিস দক্ষিণেশ্বরে।"

ঠাকুরের সাথে নরেন্দ্রনাথের এই প্রথম পরিচয়।

সময় কারও জন্যে অপেক্ষা করে না। পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। ভুলেই গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে যাবার কথা। পরীক্ষার পর নরেন্দ্রনাথের জীবনে এলো আরেক সমস্যা। বিবাহের সম্বন্ধ এসেছে। কিন্তু আজন্ম বিবাহ বিতৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথ তাতে প্রতিবাদ করলেন। বললেন তাঁর মনের কথা। জীবনে তাঁর সত্যিকারের পথকে খুঁজে বার করতে হবেই।

নরেন্দ্রনাথের কথা শুনে সেযুগের প্রসিদ্ধ ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত বললেন, "যদি সত্যিই প্রকৃত সত্যলাভ চাও, তা হলে চল দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের কাছে গিয়ে দেখতে পাবে সত্যিকারের পথ।"

তরুণ নরেন্দ্রনাথের মনে হলো শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা।

তারপর দু' একদিন বাদেই বন্ধুদের নিয়ে চললেন দক্ষিণেশ্বরে। সংশয় সন্দেহ নিয়েই গিয়ে হাজির হলেন নরেন্দ্রনাথ।

দক্ষিণেশ্বর। পবিত্র তীর্থস্থান। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে এসেছেন অনুসন্ধানী তরুণ নরেন্দ্রনাথ। কিন্তু কী আশ্চর্য!

ঠাকুর তাঁকে ডেকে নিয়ে গেলেন একান্তে। ঠাকুর কী বললেন তাঁকে? ভাবে বিভোর হয়ে নরেন্দ্রনাথের হাত ধরে বলছেন ঠাকুর:

"তুই এতদিন কেমন করে ভুলে ছিলি আমায়? তুই আসবি বলে আমি কতদিন ধরে পথ পানে চেয়ে আছি। ওরে নরেন বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা ক'য়ে আমার মুখ পুড়ে গেছেরে? আজ থেকে তোর মত যথার্থ ত্যাগীর সঙ্গে কথা বলে শান্তি পাব।"

আর তরুণ সংশয়বাদী নরেন্দ্রনাথ বিস্ময় দৃষ্টি নিয়ে ঠাকুরের দিকে চেয়ে আছেন। কি বলবেন? কিছুই বুঝতে পারলেন না নরেন্দ্রনাথ।

বিষণ্ণ মন নিয়ে ফিরে এলেন নরেন্দ্রনাথ। মনের মধ্যে সেই একই প্রশ্ন কী গভীর রহস্য ঠাকুরের মধ্যে তাই বা কে জানে?

ফিরে এসে তরুণ নরেন্দ্রনাথের মনে এলো এক নতুন বেদনা। তাঁর বিচার বুদ্ধি, সমস্ত কিছুই যেন লোপ পেতে লাগল। মনে মনে ঠিক করলেন যাচাই না করা পর্যন্ত মহাপুরুষ বলে ঠাকুরকে মানব না। কিন্তু মন কি মানে? কিসের আকর্ষণে ছুটে যেতেন দক্ষিণেশ্বরে? দ্বিধা সংশয় চিত্তে গিয়ে তরুণ নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরের পাগল পূজারীর পদ প্রান্তে আশ্রয় নিতেন। ঠাকুরের কাছে গেলেও ব্রাহ্মসমাজের নিয়মিত উপাসনায় যোগ দিতেন নরেন্দ্রনাথ। তবুও ঈশ্বর লাভের জন্য নরেন্দ্রনাথ ছুটে যেতেন গৃহ থেকে বাইরে। ঈশ্বর কি?

আর স্থির থাকতে পারলেন না নরেন্দ্রনাথ। ছুটে গেলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে। দেবেন্দ্রনাথ তখন গঙ্গাবক্ষে একখানা বোটে বাস করতেন। নরেন্দ্রনাথ গিয়ে ধ্যানমগ্ন দেবেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করলেন: মহাশয় আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছেও যখন উত্তর পেলেন না, ফিরে এলেন বিষণ্ণ মনে। মনের মধ্যে এলো নানান সংশয়, মহর্ষির মতন লোক যদি ভগবান না দেখে থাকেন তবে কে দেবেন সেই সত্যের উত্তর? তবে সব ভ্রম! সব মিথ্যে।

সারা রাত জেগে রইলেন। তখন নরেন্দ্রনাথের মনে সহসা

আলোর সঞ্চার হল। মনে হলো দক্ষিণেশ্বরের কথা! মনে হলো সেই ঠাকুরের কথা!

বাল্যকাল থেকেই নরেন্দ্রনাথের মনে কোন সংশয় দেখা দিলে শেষ পর্যন্ত তার মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত শান্তি পেতেন না! তাই ঠাকুরকে পরীক্ষা করতেও কসুর করেননি নরেন্দ্রনাথ।

কথায় কথায় ঠাকুর বলতেন : তুই যদি আমার কথা না শুনবি তা হলে এখানে এলি কেন?

নরেন্দ্রনাথ বলতেন : আপনাকে ভালবাসি, তাই দেখতে আসি, কথা শুনতে নয়।

এমনি করে ঠাকুরের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের কথা হত।

ঠাকুর বলতেন : তাইতো রে, তা'হলে কি হবে আমি যে তোকে না দেখে থাকতে পারিনে।

এমনি এক সংশয় সন্দেহ দোলায় নরেন্দ্রনাথ দুলছিলেন। ঠাকুর তা বুঝতে পেরেছিলেন।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা সৃষ্টি করল ইতিহাসের নতুন পাতা।

নরেন্দ্রনাথ আর অন্যান্য ভক্তবৃন্দরা বসে আছেন।

ঠাকুরও রয়েছেন।

ঠাকুর বললেন : এর (স্বদেহের) ভিতরে যেটা রয়েছে সেটা শক্তির, ওর (নরেন্দ্রর) ভিতরে যেটা রয়েছে সেটা পুরুষ ও আমার শ্বশুর ঘর।

ঠাকুরের কথা শুনে নরেন্দ্রনাথ মৃদু হাসলেন। সামনে সুবিশাল গঙ্গা। দিন ফুরিয়ে এসেছে। সন্ধ্যাকালে অপূর্ব দেখাচ্ছিল সেই গঙ্গা। ভক্তবৃন্দের সঙ্গীত সাধনাও নীরব হয়েছে দিবাবসান হয়ে এসেছে বলে। সন্ধ্যার ক্ষাণ ছায়া, দেবালয়ের আরতি ঘণ্টা বাজেনি তখনও।

নরেন্দ্রনাথের দিকে এক দৃষ্টি নিয়ে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

চেয়ে আছেন। সহসা আশ্চর্য এক ঘটনা ঘটে গেল, ঠাকুর আসন থেকে উঠে দক্ষিণ চরণ তাঁর স্কন্ধে স্থাপন করলেন। আর তখনই তাঁর এক আশ্চর্য ভাবাবেগ দেখা দিল। নরেন্দ্রনাথ অনুভব করলেন তিনি যেন নিজেকে কার মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন। মনে হচ্ছে তিনি একা, অবশেষে তাঁর 'আমিত্ব' বিলীন হয়ে গেল। একি আশ্চর্য প্রহেলিকা! নরেন্দ্রনাথ ভয়ে ভাবনায় চিৎকার করে উঠলেন, ওগো তুমি আমার একি করলে? আমার যে বাপ মা আছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মমতাময় স্পর্শে নরেন্দ্রনাথ আবার ফিরে এলেন স্বাভাবিক অবস্থায়। নরেন্দ্রনাথের সমস্ত গর্ব যেন চূর্ণ হয়ে গেলো!

ফিরে এলেন নরেন্দ্রনাথ। তবুও ভাবলেন একি হল? না! আর নয়। যাতে ঠাকুর ভবিষ্যতে আর না প্রভাব বিস্তার করতে পারেন তার জন্য নরেন্দ্রনাথকে সাবধান থাকতে হবে।

আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ় প্রত্যয় নরেন্দ্রনাথ ছিলেন এমনি সচেতন ব্যক্তি।

পিতা বিশ্বনাথ দত্তের আদেশ অনুসারে, নরেন্দ্রনাথ সুপ্রসিদ্ধ এটর্নী নিমাই চরণ বসুর নিকট এটর্নী ব্যবসা শিখতে লাগলেন। নরেন্দ্রনাথ তখন বি, এ, পড়ছিলেন। আর এই সময় তিনি রামতনু লেনে স্বীয় মাতামহীর ভবনে বাস করতেন। ধনীর সন্তান ছিলেন নরেন্দ্রনাথ কিন্তু সাধকের মত ছিল তাঁর জীবন যাত্রা। প্রকৃত ব্রহ্মচারীর মত জীবন যাপন করতে শুরু করলেন। এদিকে পরিবারের সকলেই নরেন্দ্রনাথের জন্য চিন্তিত হলেন, কেননা নরেন্দ্রনাথের বিবাহিত জীবনের প্রবল বিতৃষ্ণা, আর সংসারের প্রতি অনাসক্ত ভাব দেখে সকলে ভাবলেন নরেন্দ্রনাথকে কিছুতেই তাঁর চিন্তা ও মত থেকে সরানো যাবে না।

একদিন নরেন্দ্রনাথের এক বন্ধু বোঝাতে লাগলেন, বললেন,

দর্শন শাস্ত্র আলোচনা, সাধুসঙ্গ এই সব ত্যাগ কর।

নরেন্দ্রনাথ বললেন, আমার মনে হয় সন্ন্যাসই মানব জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ হওয়া উচিত।

বৈরাগ্যপ্রবণ নরেন্দ্রনাথের কথা শুনে তাঁর বন্ধু বললেন : দেখ নরেন, তোমার যে বুদ্ধি ও প্রতিভা, জীবনে তোমায় উন্নতি করতে হবে। কাজেই পাগলা ঠাকুরকে পরিত্যাগ করে ফেল। নইলে তোমার সর্বনাশ হবে।

নরেন্দ্রনাথ বললেন : ভাই তুমি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কেন বুঝতে পারছ না, আর আমিও কি বুঝতে পারি। তবুও কেন যে ভালবাসি তা আমিও জানি না।

বি. এ. পরীক্ষার পর নরেন্দ্রনাথ অবসর সময়ে সঙ্গীত সাধনায় নিজেকে বিলিয়ে দিতেন।

কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর করাল গ্রাসে বিশ্বনাথ দত্তের মৃত্যু ঘটেছে। সংবাদটা নরেন্দ্রনাথ যখন শুনলেন, তখন তিনি ছিলেন বরানগরের জনৈক বন্ধুর গৃহে সঙ্গীত সাধনায়।

নরেন্দ্রনাথ ছুটে এলেন তখনই বাড়ীতে। এসে দেখলেন পিতার মৃতদেহকে বেষ্টন করে মা ও ভাই বোনেরা কাঁদছেন। নরেন্দ্রনাথ যেন সমস্ত কিছু অন্ধকার দেখলেন। পিতৃশোকে অধীর হয়ে বালকের মত কাঁদতে সুরু করলেন।

সময় কারও জন্য অপেক্ষা করে না। বিশ্বনাথ দত্তের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের যেন নবজন্ম সুরু হল। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত যথেষ্ট উপার্জন করেছিলেন, কিন্তু কিছুই তিনি রেখে যেতে পারেন নি। উদার ও মুক্ত হস্তে দানের জন্যেই এই পরিণাম।

নরেন্দ্রনাথ চিন্তিত হয়ে উঠলেন। কি ভাবে সংসার চালাবেন? সদ্যবিধবা জননী, ভাইবোনেরা, আত্মীয় স্বজন, এদেরই বা কি হবে? দারিদ্র্যের কঠোর স্পর্শে শিউরে উঠলেন তিনি।

কিন্তু নির্ভীক তরুণ নরেন্দ্রনাথ অভাবে অনটনে বিচলিত হননি।

নরেন্দ্রনাথ আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন, আর সেই সঙ্গে কাজ করার জন্যও চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সবই যেন পাল ছাড়া দিকহারা নাবিকের মত। এই সংকটময় কালে নরেন্দ্রনাথের মনে বিরাট প্রশ্ন এসে দেখা দিল। তাঁর ব্যথিত হৃদয়ে এই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে এসে মনের আয়নায় ধরা দিল। "ভগবান কি দরিদ্রের কাতর ক্রন্দন শুনতে পান না? অথবা শুনতে চান না? দুঃখীর ক্রন্দনে তাঁহার হৃদয় কি আদ্র´ হয় না—তিনি কি হৃদয়হীন?"

নরেন্দ্রনাথকে দেখবার জন্য ঠাকুর ডেকে পাঠিয়েছেন।

অভাব আর অনটন আর নিয়ত এই অশান্ত মনের যন্ত্রণা, নরেন্দ্রনাথ তবুও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে পারলেন না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই আয়নায় সেই একই প্রতিচ্ছবি! একি আশ্চর্য!

ঠাকুর এসেছেন কলকাতায়। নরেন্দ্রনাথও ছুটে গেলেন। কিন্তু কী পেলেন নরেন্দ্রনাথ, দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরে এলেন একটা অদ্ভুত আনন্দের আশার বাণী নিয়ে। তরুণ সাধকের মনে যে কুয়াশা ছিল সমস্ত দূরে সরে গেলো।

কিন্তু দিনের পর দিন সেই একই ঘটনার প্রতিচ্ছবি। অভাব আর অভাব। নরেন্দ্রনাথ ভাবলেন. ঠাকুর হয়ত তাদের এই কষ্ট দূর করে দিতে পারেন। আর তখনি ছুটে গেলেন ঠাকুরের কাছে!

ঠাকুরের কী আনন্দ। নরেন্দ্রনাথ এসেছেন। নরেন্দ্রনাথ বললেন: ঠাকুর, যাতে আমার মা ও ভাইবোনদের খাওয়াতে পরাতে পারি তার জন্য আপনার মাকে বলে দিন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এই কথা শুনে হাসলেন। তারপর বললেন: তুই তো মাকে মানিস না, তাই তোর কথায় মা কান দেন না। নরেন্দ্রনাথ এই কথা শুনে চমকে উঠলেন। ঠাকুর আবার বললেন মায়ের কৃপা ছাড়া কিছু হবে না। আজ মঙ্গলবার, আমি বলছি

আজ রাত্রে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি মা তাই দেবেন।

নরেন্দ্রনাথের মনে সংশয়, তবু বিশ্বাস থাক আর নাই থাক ঠাকুরের কথার সত্যতা তাঁকে প্রমাণ করতে হবেই।

কিন্তু কী চাইলেন নরেন্দ্রনাথ আর বিনিময়ে কী পেলেন তিনি। নরেন্দ্রনাথ সংশয় চিত্তে কালীঘরে গেলেন। তিনি দেখলেন, জগদম্বার আশ্চর্য ভুবনমোহনরূপে সেই প্রাঙ্গণ আলোকিত হয়ে উঠেছে। এ যেন সজীব মূর্তি, যেন জীবন্ত। নরেন্দ্রনাথ সব ভুলে গিয়ে বললেন: মা বিবেক দাও। বৈরাগ্য দাও। জ্ঞান দাও। ভক্তি দাও। যেন তোমার কৃপায় সব সময়েই তোমাকে দেখতে পাই।

নরেন্দ্রনাথ ফিরে এলেন।

ঠাকুর মৃদু হেসে বললেন: কিরে কি চাইলি?

নরেন্দ্রনাথ বললেন না কিছুই। ঠাকুর বললেন: যা যা চেয়ে নিয়ে আয়। নরেন্দ্রনাথ আবার গেলেন। একবার নয়। বার বার তিনবার। কিন্তু গিয়ে সেই একই কথা: মা, বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি দাও, যেন তোমার কৃপায় সর্বদাই তোমাকে দেখতে পাই।

ঠাকুর বললেন: তুই যখন চাইতে পারলি না তখন তোর অদৃষ্টে সংসার সুখ নেই, তবে তোদের মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না।

নরেন্দ্রনাথ ফিরে এলেন। আর তরুণ নরেন্দ্রনাথের জীবনের এক নতুন অধ্যায় সুরু হল যেন।

এই সময়েই তরুণ নরেন্দ্রনাথ এটর্নী অফিসে কাজ করতেন। আর তার পরেই স্থায়িভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলে শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করলেন।

দিন বদলের পালা শেষ হতে চলেছে যেন। সেদিনের সেই দার্শনিক, উদ্ধত তরুণ নরেন্দ্রনাথ আজ তরুণ সাধক রূপে অবতী

হয়েছেন। ইতিমধ্যে নরেন্দ্রনাথ ফিরে এসেছেন বোধিসত্ত্বের মন্দির দর্শন করে। বুদ্ধ গয়া থেকে ফিরে এসে নরেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন যে অতৃপ্ত কামনায় সে এতদিন মরীচিকার মতন ঘুরছে। একমাত্র সত্য হচ্ছে ঠাকুরের কৃপা। নরেন্দ্রনাথ স্বীয় সমস্ত বিদ্যার মধ্যে দিয়েও যে সত্যের সন্ধান পাননি, সেই পরম পুরুষের আশ্চর্য পরশে নরেন্দ্রনাথ হলেন এক বিশাল পর্বতের মত স্থির ও সভ্যতার জীবন্ত ছবি। ১৮৮৬ সালের জুলাই মাসের শেষের দিক।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব রোগ শয্যায় শায়িত।

নরেনকে ডেকে বললেন ঃ নরেন আমার সব ছেলেরা রইল, তুই সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান, ওদের রক্ষা করিস, সৎপথে চালাস, আমি তো চলে যাচ্ছি।

নরেন্দ্রনাথ নির্বিকার ছিলেন।

অবশেষে এলো সেই দিন ১৮৮৬ সালের ১৫ই আগস্টরবিবার।

ঠাকুর বললেন ঃ বাবা আজ তোকে সর্বস্ব দিয়ে ফকির হলুম!

মহাপুরুষের শয্যা ঘিরে সবাই মহাসমাধির প্রতীক্ষা করছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের মনে এখন বিরাট বিপ্লব! সত্যি কি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যুগধর্ম প্রবর্ত্তক অবতার পুরুষ?

আজ নরেন্দ্রনাথের জীবনে যেন এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে। তরুণ নরেন্দ্রনাথই পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দারূপে বিশ্বমানব হৃদয়ে অক্ষয় হয়ে রইলেন। সাধনায় ও নিষ্ঠায় তরুণ নরেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় পেলেন নতুন জীবন।

তারপর স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের স্রোত এগিয়ে গেলো নতুন কাজে নতুন চিন্তায়।

শ্রীশ্রীরানকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পরই কাশীপুরের বাগান বাটী ছেড়ে দিতে হল। তরুণ সাধক নরেন্দ্রনাথ দেখলেন সবাই যদি

এমন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তা হলে ঠাকুরের আদর্শ কেমন করে সিদ্ধ হবে?

চিন্তায় ও সমস্যার মধ্যে এসে হাজির হলেন নরেন্দ্রনাথ। কী করবেন? উপায় একটা ঠিক হল। নরেন্দ্রনাথের উৎসাহে ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সবাই আবার মঠে ফিরে এল।

কাজে নিজেদের ডুবিয়ে দিলেন সবাই। তাদের প্রাণে নতুন আশা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শকে সফল করে তুলতেই হবে।

আর তরুণ সাধক নরেন্দ্রনাথের যেন বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হল বজ্র নিনাদের কণ্ঠে, তিনি বললেন : হে অমৃতের সন্তানগণ। অমৃত পান করিবার জন্য জাগরিত হও।

নরেন্দ্রনাথের এই অমৃত বাণী গ্রহণ করে এগিয়ে এলো দলে দলে তরুণ সাধক সন্ন্যাসীরা।

নরেন্দ্রনাথের জীবনের ধারা গেল বদলে। আজ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী চির তরুণ বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ, তরুণ সাধক নরেন্দ্র-নাথের জীবন দর্শন যেন মেহনতী মানুষের সংগ্রামের মুক্তি সাধনা।

নরেন্দ্রনাথ মানস চোখে যেন দেখতে পেতেন বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধনায় তাঁর জীবন উৎসর্গ হয়েছে সেবায় ও কাজে।

তাই তিনি বলতেন : জয় রামকৃষ্ণ। মানুষ গড়ে তোলাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হোক। বৃথা বিদ্যার গর্ব পরিত্যাগ কর। ঈশ্বরানুভূতিই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবনে এ আদর্শ দেখিয়ে গেছেন। আমরা তাঁরই আদর্শ জীবন অনুসরণ করবো।

তরুণ সাধক বীর বিবেকানন্দের এই অমৃত বাণী পান করে সার্থক হলেন তরুণ সন্ন্যাসীর দল।

বরানগর মঠে বাস করছেন সন্ন্যাসীরা। শ্রীরামকৃষ্ণের

পতাকাবাহী সর্বত্যাগী সাধক দলেরা। পুরোভাগে ঋষিতনয় নরেন্দ্রনাথ।

পরবর্তী জীবনে তাঁরই প্রকাশ প্রতিফলিত স্বামী বিবেকানন্দ-রূপে। বীর সাধক, বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ভারত ভ্রমণ কাহিনী আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নিবিড়ভাবে।

স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক বেশে বেরিয়ে পড়লেন। যেখানেই তিনি গিয়েছেন, তাঁর তপ্তকাঞ্চন-বর্ণ দীর্ঘ তপোজ্জ্বল মুখশ্রী দেখে সবাই অবাক হয়ে যেতো। ভাবতো কে এই তরুণ সন্ন্যাসী!

বিহার, যুক্তপ্রদেশের মধ্যে দিয়ে অবশেষে এলেন হিন্দুর পবিত্র তীর্থ কাশীধামে।

কাশীধাম, পুণ্য তীর্থ ভূমি। স্বামী বিকেকানন্দ এলেন দ্বারকা দাসের আশ্রমে। রিক্ত নিঃস্ব সাধক তিনি। সঙ্গে তাঁর কিছুই নেই তবুও সমস্তই যেন পূর্ণ।

বারাণসীর বিখ্যাত সাধু শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরের দ্বিতীয় বিগ্রহতুল্য শ্রীমৎ তৈলঙ্গস্বামীর দর্শন লাভ করলেন বিবেকানন্দ। এই মহানপুরুষের দর্শন লাভে বিবেকানন্দ তাঁর প্রাণের শ্রদ্ধা জানালেন, আর সেই সঙ্গে তাঁর সহাস্য মুখশ্রীতে উদ্ভাসিত হলো ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

সেই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমরা উল্লেখ করব। যে ঘটনার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের বীরোচিত ও সাহসের পরিচয় পাওয়া গেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ গেছেন শ্রীমৎ স্বামী ভাস্করানন্দজীর কাছে। শ্রীমৎ স্বামী ভাস্করানন্দজী তখন তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বসেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মনোহর অঙ্গকান্তি দেখে শ্রীমৎ ভাস্করানন্দজী মুগ্ধ হলেন। তারপর সন্ন্যাস জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা

করতে গিয়ে ভাস্করানন্দর বললেন ঃ জগতের কোন ব্যক্তিই সম্পূর্ণ রূপে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ বললেন ঃ আপনার কথা শুনে আশ্চর্য হচ্ছি। এমন অনেক সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা সম্পূর্ণরূপে কাম কাঞ্চনের বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করেছেন। কেননা সন্ন্যাস জীবনের প্রধান ব্রতই হচ্ছে কামিনী কাঞ্চন থেকে দূরে সরে যাওয়া। আমি অন্ততঃ এমন একজনকে চিনি, যাঁকে দেখেছি, যিনি কাম কাঞ্চন স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে জয় করেছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তারই প্রকৃত উদাহরণ।

স্বামী বিবেকানন্দের কথা শুনে ভাস্করানন্দজী হেসে বললেন ঃ তুমি বালক মাত্র, এ বয়সে ও সব বুঝতে পারবে না।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর তেজোগর্ভ যুক্তিপূর্ণ কথার দ্বারা প্রমাণ করলেন তাঁর কথা সত্য।

আশ্চর্য হয়ে গেলো সবাই, যে ভাস্করানন্দজীর চরণ তলে মহারাজা, ধনী, পণ্ডিত শত শত ব্যক্তি নতমস্তকে থাকে, তাঁর বিরুদ্ধে তরুণ সন্ন্যাসীর এই নির্ভীকতা এক আশ্চর্যের বিষয়।

এমনি নির্ভীক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ!

স্বামী বিবেকানন্দ ভারত ভ্রমণ কালে যেন দেখতে পেলেন ভারতবর্ষের যুগ যুগ সঞ্চিত একতার মহান মন্ত্র। ভারতবর্ষকে দেখতে হবে, বুঝতে হবে, এই লক্ষ কোটি নরনারীর জীবন যাত্রার কত বিভিন্ন স্তরে কি মর্মান্তিক বেদনা তাকে বুঝতে হবে। পরিব্রাজক রূপে স্বামী বিবেকানন্দ ভাবতবর্ষের মুক্তি সাধনার অগ্রদূত।

শুরু হল কাশী থেকে তীর্থ যাত্রা। ১৮৮৮ সালে আগস্ট মাসে বিবেকানন্দ উত্তর ভারতের নানা স্থান দিয়ে সরযূ নদী তীরে অযোধ্যায় এলেন।

অযোধ্যা...।

এই অযোধ্যার ধূলিতে মাটিতে জড়িয়ে আছে নানা গৌরবময় স্মৃতি।

তাঁর মানস পটে অতীতের সমস্ত কীর্তি গাঁথা উদয় হলো। সীতারামের এই পুণ্যভূমিতে আসামাত্রই মনে হলো এ যেন সেই পবিত্র পুণ্যতীর্থ কবিগুরু বাল্মীকির মানসভূমি।

অযোধ্যার পর স্বামী বিবেকানন্দ লক্ষ্ণৌ ও আগ্রার পথে শ্রীবৃন্দাবনধামের দিকে এগোতে লাগলেন।

বৃন্দাবনে আসার আগে স্বামীজী আগ্রায় ভুবন মোহিনী তাজমহল এবং বিশাল মোগল দুর্গ দর্শন করে বৃন্দাবনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

বৃন্দাবনে আসার পথে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

স্বামীজী দেখতে পেলেন, পথের পাশে কে একজন আপন মনে তামাক খাচ্ছে। স্বামীজীর মনে হলো পথশ্রমে যখন ক্লান্ত তখন দু' এক টান দেওয়া যাক।

কিন্তু সেই লোকটা স্বামীজীকে বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে, "মহারাজ, ময় ভাঙ্গী হুঁ।" অর্থাৎ আমি মেথর।

স্বামীজী আর হাত বাড়ালেন না। ওখান থেকে সরে গেলেন। কিন্তু পথে আসতে আসতে তাঁর মনে হলো, আমি না সন্ন্যাসী! আমি না সর্বত্যাগী। তবে কেন সংস্কার মুক্ত হইনি? কেন মেথর বলে চলে এলাম? সেও তো মানুষ! আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না বিশ্বপ্রেমিক বীর বিবেকানন্দ। ফিরে এলেন আর তারপর পরম তৃপ্তির সঙ্গে ধূমপান করলেন।

আর একটি আশ্চর্য ঘটনা আমরা দেখতে পাই রাধাকুণ্ডে। স্বামী বিবেকানন্দের এক অপূর্ব অভিজ্ঞতার ঘটনা।

একদিন পরিধানের একমাত্র সম্বল কৌপীনখানা ধুয়ে তীরে

রোদে মেলে দিলেন। তারপরে স্নান করতে পবিত্র সলিলা রাধাকুণ্ডে অবতরণ করলেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য। স্নানের পর স্বামীজী দেখলেন তাঁর একমাত্র সম্বল সেই কৌপীনখানি সেখানে নাই। কোথায় গেল? চারিদিকে তাকালেন, দেখতে পেলেন একটা গাছে এক বানর বসে আছে, আর কৌপীনখানা সযত্নে বানরের কাছে রয়েছে। স্বামীজীর পরিধানে কোন বস্ত্র নাই। সমস্যায় সংকুল হয়ে উঠলেন স্বামীজী। কী করবেন। যতক্ষণ কোন পরিধেয় বস্ত্র না পান, ততক্ষণ তিনি গভীর অরণ্যেই বিচরণ করবেন। হঠাৎ পিছন ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলেন এক অজানা লোক তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। আশ্চর্য হয়ে গেলেন স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু স্বামীজী আবার দ্রুতপদে চলতে সুরু করলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, সেই অজানা ব্যক্তিটিও ছুটে এসে স্বামীজীর পদপ্রান্তে আশ্রয় নিলেন! স্বামীজী বিস্ময় দৃষ্টিতে তাকালেন তাঁর দিকে, দেখলেন অজানা ব্যক্তির হাতে খাদ্য-
বা ও একখানা গৈরিক বসন। নবাগতের অনুরোধে স্বামীজী
। গ্রহণ করলেন। তারপর আবার ফিরে এলেন স্বামীজী
াধাকুণ্ডে। আবার এক পরম আশ্চর্য ঘটনা, স্বামীজী দেখলেন
ার সেই অপহৃত কৌপীনখানা ঠিক তেমনি রয়েছে যথাস্থানে।

স্বামী বিবেকানন্দের মনে এক গভীর পরিতৃপ্তির ভাব দেখা দিল।
দীর্ঘপথ ভ্রমণে পরিশ্রান্ত স্বামী বিবেকানন্দ। তবুও চলার
াষ নেই। রাধাকুণ্ড তীরে কৃষ্ণ গুণগান গেয়েছিলেন তিনি। ভাব
াবেগে তন্ময় হয়েছিলেন স্বামীজী।

তারপর একটানা পথ চলা। পরিশ্রান্ত। ক্লান্ত। তাই
মীজী পথের ধারে এক গাছের তলায় বিশ্রাম করছিলেন।
র সেই পথ ধরেই আসছিলেন হাতরাস রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার
ৎচন্দ্র গুপ্ত। শরৎচন্দ্র গুপ্ত স্বামীজীকে দেখতে পেয়েই চমকে

উঠলেন। ভক্তপ্রাণ শরৎচন্দ্র গুপ্ত স্বামীজীর পদধূলি গ্রহণ করলেন।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন এই শরৎচন্দ্র গুপ্তই স্বামীজীর সর্বপ্রথম শিষ্য হয়ে পরবর্তী জীবনে শ্রীমৎ স্বামী সদানন্দ নামে পরিচিত।

শরৎচন্দ্র বললেন: আপনি পরিশ্রান্ত। দয়া করে আমার গৃহে চলুন। সেইখানেই বিশ্রাম করবেন।

স্বামীজী শরৎচন্দ্রের অনুরোধ রক্ষা করলেন। এর পরের ঘটনা সেও এক আশ্চর্য ইতিহাস। এই শরৎচন্দ্র তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করলেন সমাজ ও মানব কল্যাণে। মহামানব বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে তাঁর জীবন হল ধন্য।

শরৎচন্দ্র বললেন: অনেক দিন ধরেই যেন আপনার পথ চেয়ে আছি। যখন আপনার দর্শন পেয়েছি, তখন দয়া করে আমায় গ্রহণ করুন।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রসন্ন ভাবে শরৎচন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন কি অসীম প্রদীপ্তময় যুবক।

একদিন শরৎচন্দ্র স্বামীজীকে চিন্তাকুল অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন: স্বামীজী আপনাকে আজ বিষণ্ন দেখছি কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর তেজদীপ্ত কণ্ঠে বললেন: বৎস, এক মহৎ কাজ করবার দায়িত্ব নিয়ে আমি চলেছি। কিন্তু আমার কতটুকু শক্তি, আমি ক্ষুদ্র। মনে হয় আমার দ্বারা কিছুই হবে না।

শরৎচন্দ্র শুনলেন অধীর আগ্রহে।

স্বামী বিবেকানন্দ বললেন আরও: যতই দিন যাচ্ছে, ততই যেন মনে হচ্ছে, সনাতন ধর্মের লুপ্ত গৌরবই পুনরুদ্ধার করাই ঠাকুরের ইচ্ছা। হায়! আজ ধর্মের কী শোচনীয় অবস্থা। আর দেখো সেই সঙ্গে অন্নক্লিষ্ট ভারতবাসীর কি শোচনীয় দুরবস্থা। তাই আজ ভারতকে পুনরায় ধর্মের শক্তিতে ফিরিয়ে আনতে হবে কিন্তু উপায় কি?

ভক্তপ্রাণ শরৎচন্দ্র বললেন : আমি কি আপনার কোন কাজে লাগতে পারি না ?

বীর বিবেকানন্দ এই কথা শুনে বললেন : পারবে তুমি এই মহৎ কাজের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে ? পারবে তুমি ভিক্ষাপাত্র আর কমণ্ডলু সঙ্গে নিয়ে পথে দাঁড়াতে ?

তখন শরৎচন্দ্র বললেন : পারব, আপনার দয়া হলে সমস্তই পারব।

তারপর সেও আরেক ইতিহাস !

হাতরাস থেকে স্বামী বিবেকানন্দ আবার ফিরে যাবেন তার চলার পথে।

শরৎচন্দ্র বললেন : আমাকে আপনার সঙ্গে নিন।

স্বামী বিবেকানন্দ তখন বললেন : তুমি কি মনে কর আমার সঙ্গে গেলে বা আমার শিষ্য হলে তোমার আধ্যাত্মিক পিপাসা মিটবে ?

শরৎচর পুনরায় বললেন : আমি আপনার সঙ্গে যাব। আমাকে দীক্ষা দিন।

স্বামীজী স্মিত হাস্যে বললেন : সত্যি সত্যি তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে ?

শরৎচন্দ্র আনন্দে বিভোর হয়ে উঠলেন।

স্বামীজী বললেন : উত্তম, তবে এই আমার ভিক্ষার ঝুলি গ্রহণ কর। আর তোমার স্টেশনের কুলিদের কাছ থেকে ভিক্ষা চেয়ে নিয়ে এসো।

শরৎচন্দ্র নির্ভীক চিত্তে তখনই বেরিয়ে পড়লেন। ফিরে এলেন বিজয় গৌরবে। তারপর পিতামাতার আশীর্বাদ নিয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে শরৎচন্দ্র স্বামীজীর সংগে চললেন।

নব দীক্ষিত শরৎচন্দ্র হলেন স্বামী সদানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ পদব্রজে ভারত ভ্রমণকালে দেখতে পেয়েছিলেন ধর্মের প্রতি ভারতবাসীর অনুরাগ আছে, কিন্তু সামাজিক জীবনে স্বাভাবিক গতিশীলতা নেই। তাই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল অভয় মন্ত্রের বাণী, "দোষ ধর্মের নয়, ধর্মের নামে ধর্ম ব্যবসায়ীর। গুরু, পুরোহিত পাণ্ডাদের সমাজের উপর আধিপত্যই সমাজের জীবনকে অচল করে রেখেছে।......আজ তাই ভারতবাসীকে এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত করতে হলে আমাদের সমস্ত বদ্ধমূল সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।"

স্বামীজী হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন।

১৮৯১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। স্বামীজী আলোয়ার স্টেশনে নেমে, নগরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

সেখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার গুরুচরণ লস্কর মহাশয় ও উচ্চ বিদ্যালয়ের মৌলবী সাহেব স্বামীজীকে থাকবার জন্য জায়গা ঠিক করে দিলেন। তাঁর আসার সংবাদ পেয়ে দলে দলে কাতারে কাতারে হিন্দুমুসলমান আসতে শুরু করলো।

এখানকার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমরা উল্লেখ করব।

স্বামীজীর কথা শুনে আলোয়ার রাজ্যের দেওয়ান বাহাদুর স্বামীজীকে সাদরে তাঁর বাড়ীতে ডেকে নিয়ে এলেন।

এইখানেই দেওয়ান বাহাদুর ভবনে মহারাজ মঙ্গল সিংহের সাথে দেখা হল স্বামীজীর।

মহারাজ স্বামীজীকে প্রণাম করলেন।

মহারাজ বললেন: স্বামীজী আমি শুনেছি আপনি একজন বিদ্বান ও মহাপণ্ডিত। আপনি তো ইচ্ছে করলেই প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারেন, তবুও কেন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পথে বের হয়েছেন?

স্বামী বিবেকানন্দ বললেন: মহারাজ। আগে আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনি রাজকার্য অবহেলা করে সাহেবদের সঙ্গে কেন মৃগয়া করেন, কেনই বা বৃথা আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করেন ?

মহারাজ জবাব দিলেন: আমার ভালো লাগে তাই করি।

স্বামীজী হেসে জবাব দিলেন: মহারাজ, ভালো লাগে বলেই তো আমি ফকিরের বেশে ঘুরে বেড়াই।

স্বামীজীর কথা শুনে মহারাজ মঙ্গল সিংহ স্পষ্ট বুঝতে পারলেন এই বীর সন্ন্যাসী শুধু পণ্ডিত নয়, তিনি নির্ভিক ও স্পষ্টবক্তা!

মহারাজ বললেন: দেখুন স্বামীজী, মুর্তি পূজাকে আমি বিশ্বাস করি না, এতে কি আমার অমঙ্গল হবে ?

স্বামী বিবেকানন্দ গুরু গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন: ,মহারাজ কি আমার সঙ্গে রহস্য করছেন ?

মহারাজ মঙ্গলসিংহ বললেন: স্বামীজী। আমি রহস্য করছি না। সত্যিই আমি মূর্তি পূজা বিশ্বাস করি না। প্রকৃতই আমি কাঠ, মাটি, পাথর বা ধাতুর মূর্তিগুলিকে সাধারণের মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে পারি না; জানি না এর জন্য আমাকে পরকালে নিগ্রহ ভোগ করতে হবে কিনা ?

স্বামীজী বললেন, নিজের বিশ্বাসানুযায়ী উপাসনা করলে পর-কালে শাস্তি পাবেন কেন ?

স্বামীজীর কথা শুনে সকলেই অবাক হয়ে গেলো।

তারপর আরেকটি আশ্চর্য ঘটনা এখানে উন্মোচিত হল।

স্বামী বিবেকানন্দ দেখলেন মহারাজার একখানা আলোকচিত্র। স্বামীজী বার বার দেখলেন। তারপর দেওয়ান বাহাদুরকে প্রশ্ন করলেন: এ ছবিখানা বোধ হয় মহারাজ বাহাদুরের প্রতিকৃতি।

দেওয়ান বাহাদুর বললেন: আপনার অনুমান সত্য!

স্বামী বিবেকানন্দ চিত্রখানাকে মাটিতে রাখলেন।

তারপর দেওয়ান বাহাদুরকে বললেনঃ আপনি এই ছবির উপর থুথু ফেলুন।

বিস্ময়ে হতবাক দেওয়ান বাহাদুর। আর সমবেত ব্যক্তিরাও স্বামীজীর এই অদ্ভুত বাক্যে আশ্চর্য হয়ে গেলো।

স্বামী বিবেকানন্দ গুরু গম্ভীর কণ্ঠে সকলকে বললেনঃ ভয় কি? এ তো একখানা ছবি? আপনারা যে কেউ এই ছবির উপর থুথু ফেলুন। এ তো সামান্য একখণ্ড কাগজ ছাড়া আর কিছুই নয়?

সকলেই স্বামীজীর মুখের দিকে তাকালেন। রাজা মঙ্গলসিংহ নীরব। তারপর দেওয়ান বাহাদুর বললেনঃ আপনি কী বলছেন স্বামীজী? মহারাজের চিত্রের উপর কি করে আমরা থুথু ফেলতে পারি?

স্বামীজী সহাস্যে বললেনঃ মহারাজের ছবি, তাতে কি আসে যায়? এতে তো মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত নেই। এক টুকরো কাগজ মাত্র। তবুও আপনারা এ কাজ করতে পারছেন না কেন?

সকলেই স্বামীজীর কথা শুনে পরম বিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলো। আর স্বামীজী মহারাজের প্রতি লক্ষ্য করে বললেনঃ দেখুন মহারাজা। আমরা বিচার করলে দেখতে পাই, এ আপনি নন। আবার এও বুঝতে পারি এ চিত্রের মধ্যে আপনার অস্তিত্ব আছে। আর সেই জন্যই কেউই এই চিত্রে থুথু ফেলতে পারল না। কারণ সবাই আপনার অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত সেবক। আপনার সেবা করাই এঁদের কাজ। কাজেই আপনার প্রতি অসম্মানজনক কোন কাজ করা এঁদের সাধ্য নয়। ঠিক তেমনি বিচার করুন, দেখবেন প্রস্তর, ধাতুর প্রতিমাগুলিও শ্রীশ্রীভগবানেরই প্রতিমূর্তি। কাজেই ভক্তের মনে এ সব বস্তুই শ্রদ্ধার ও পূজার বস্তু। ভক্ত সাধকগণ মূর্তির ভিতর দিয়েই ভগবানের উপাসনা করেন। ধাতু বা প্রস্তর পূজা করেন না।

মন্ত্রমুগ্ধের মতন সবাই স্বামীজীর এই অমৃতময় বাণী শুনে ধন্য হল।

স্বামী বিবেকানন্দ বললেন: আমি অনেক স্থানে ভ্রমণ করেছি। কিন্তু কোন হিন্দুকে বলতে শুনিনি 'হে ধাতু, হে প্রস্তর, আমি তোমাকে পূজা করছি।'

মহারাজ মঙ্গলসিংহের দিব্যদৃষ্টি খুলে গেলো। যুক্ত করে মহারাজ বললেন: স্বামীজী আপনার কৃপায় আমার সমস্ত ভুলের অবসান হল। আমাকে আশীর্বাদ করুন।

স্বামীজী সহাস্য বললেন: একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কারও সাধ্য নেই কৃপা করবার। মহারাজ আপনি সরল মনে ভগবানের চরণে শরণাগত হোক, তিনিই কৃপা করবেন!

স্বামী বিবেকানন্দ চলে যাবার পর মহারাজ বললেন: আশ্চর্য এই বীর সন্ন্যাসী। এমন মহাপুরুষের দেখা পাওয়া ভাগ্যের কথা।

জয়পুরে এলেন বিবেকানন্দ।

জয়পুরের প্রধান সেনাপতি হরসিংহের সঙ্গে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। স্বামীজী তাঁর সঙ্গে প্রায়ই ধর্মালোচনা করতেন।

কিন্তু এই সরদার সাহেব ছিলেন মূর্তিপূজার বিরোধী।

একদিন রাজপথে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ সহ শোভাযাত্রা চলেছে। হঠাৎ স্বামীজী সরদারকে স্পর্শ করে বললেন: দেখুন শ্রীভগবানের জীবন্ত বিগ্রহ।

আর সে কথা শোনা মাত্র সরদারজী যেন অন্য জগতে চলে গেলেন। অশ্রুসজল কণ্ঠে তাঁর ভাষা রইল না। খানিক পরে বললেন: স্বামীজী ধন্য আপনি! অনেক তর্ক করেও যে বিষয়ে বুঝতে পারিনি, আজ আপনার কৃপায় তাই ফিরে পেলাম। আজ আমার জীবন ধন্য হল।

এখানে একদিন স্বামীজী ধর্ম নিয়ে আলোচনা করছিলেন এমন সময় জয়পুরের বিখ্যাত পণ্ডিত সূরয নারায়ণ এলেন।

কথায় কথায় বললেন পণ্ডিত সূরয নারায়ণ: আমি একজ বেদান্তী, কাজেই আমি অবতার পুরুষদের বিশেষ আধ্যাত্মিব শক্তিতে বিশ্বাস করি না। আর পৌরাণিক অবতারেও আমা বিশ্বাস নেই।

স্বামীজী হেসে উত্তর দিলেন: আপনার কথাই সত্য তবে হিন্দুরা মৎস্য কচ্ছপ বরাহকেও অবতার বলে। তার মধে আপনি কোন্‌টি?

সভায় সকলে হেসে উঠলো। স্বামী বিবেকানন্দ পরিহাস রসিক ছিলেন।

জয়পুর থেকে চলে আসার পর স্বামীজী এলেন আজমীড়ে।

এখানকার এক গুহায় তিনি আশ্রয় নিলেন। মনোহর আবু পর্বতে স্বামীজী ছিলেন। খবর পেয়ে ছুটে এলেন কোটা দরবারের একজন মুসলমান উকিল। স্বামীজীকে নিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে।

ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভদ্রলোক স্বামীজীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে কোটার দরবারের প্রধান মন্ত্রী ঠাকুর ফতে সিংহ প্রভৃতিকে ডাকলেন। যাঁরা এলেন, বিস্ময় নেত্রে তাকিয়ে রইলেন সর্বত্যাগী বীর সাধক বিবেকানন্দের দিকে।

ছুটে এলেন খেতরির রাজা বাহাদুরের সেক্রেটারী মুনসী জগমোহন লাল। দর্শন করতে এসেছিলেন মুনসীজী। স্বামীজী তখন একমাত্র পরিধানে ছিল, কৌপীন। স্বামীজী খাটিয়াতে শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন!

মুন্‌সীজী ভাবছিলেন, অতি সাধারণ ভবঘুরে সাধু।

মুন্সীজী বললেন: আপনি হিন্দু হয়ে মুসলমানের গৃহে আশ্রয় নিয়েছেন কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ গুরু গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন: আমি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী! আমি সমস্ত সামাজিক আচার নিয়মের বাইরে। আমি মেথরের সঙ্গে একসঙ্গে বসে সানন্দে আহার করতে পারি। ভগবানের বিধানে সব এক! আমি নির্ভয়। শাস্ত্রকে আমি ভয় করি না। কেননা শাস্ত্র এই কথাই বলে সব সমান। কিন্তু আমার ভয় কিসে জানেন, আমার ভয় আপনাদের মত সবজান্তা ইংরাজীনবীশ শিক্ষাবিদকে। আপনারা শাস্ত্র ও ভগবান মানেন না। কিন্তু আমি? আমি সর্বভূতে ব্রহ্ম জ্ঞান করি। আমার নিকট সব সমান।

জগমোহন স্বামীজীর কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

শুধু কি তাই? তারপর স্বামীজীকে নিয়ে এলেন রাজভবনের

রাজা প্রথম দর্শনেই গভীর শ্রদ্ধা জানালেন। বললেন রাজা বাহাদুর: স্বামীজী! জীবনটা কি?

স্বামী বিবেকানন্দ বললেন: একটা অন্তর্নিহিত শক্তি যেন ক্রমাগত স্বরূপে ব্যক্ত হবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করছে, আ বহিঃপ্রকৃতি তাকে দমন করবার চেষ্টা করছে। এই সংগ্রামের নামই জীবন!

রাজা স্বামীজীর এই কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। শুধু তাই নয় স্বামীজীকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন নিজের রাজ্যে। ধর্মপ্রাণ রাজা অজিত সিংহ ও সেক্রেটারী জগমোহন মুন্সী ামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

পোরবন্দরে এসেছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

পোরবন্দরের বিখ্যাত পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ এঁর সাথে পরিচয় হয়ে স্বামীজী প্রীত হলেন। আর এই সময়েই গোবর্ধন মঠের

জগদগুরু শ্রীশ্রীমৎ শঙ্করাচার্য মহারাজ পোরবন্দরে এসেছিলেন।

সভা বসেছে। সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন শ্রীশ্রীমৎ শঙ্করাচার্য মহারাজ।

স্বামীজীর বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় ইতিমধ্যেই পণ্ডিত মহলে আলোচিত হয়েছিল। আর আজ এই সভায় স্বামী বিবেকানন্দের বিনয়, পাণ্ডিত্য, তেজস্বিতা দেখে পণ্ডিতরা মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

আর শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য মহারাজ, স্বামিজীর এই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পেয়ে আশীর্বাদ করলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের পবিত্রময় সাধক জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরথ বললেন: স্বামীজী! আমার মনে হয় এদেশে ধর্ম প্রচার করে আপনার বিশেষ সুবিধা হবে না। আপনার এই মহৎ কাজ ও প্রচার আমাদের দেশে লোকদের হয়ত বুঝতে দেরী হবে। আপনি পাশ্চাত্য দেশে যাবার জন্য অগ্রসর হোন। আমি বলছি বৃথা শক্তি না ক্ষয় করে আপনি বিদেশ যাত্রা করুন। সে দেশের লোক মহত্ত্বের ও প্রতিভার আদর জানে। আপনার জয়যাত্রা একদিন সারা ভারতবর্ষ তথা সমগ্র পৃথিবীর লোক স্বীকার করবে, আপনার জ্ঞানের স্পর্শে যুগান্তর আসবে।

মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান আর. কে. শেষাদ্রি বাহাদুর স্বামীজীর সাথে পরিচয় করলেন। শুধু তাই নয়, নিয়ে এলেন মহারাজা চামরাজেন্দ্র ওয়াডিয়ারের কাছে।

একদিন মহারাজা স্বামীজীকে বললেন: স্বামীজী! আমি এত বড় একজন মহারাজা। আপনার আমাকে ভয় করা উচিত! খোসামোদ করবেন। ভবিষ্যতের দিকে তাকাবেন।

বলা নিষ্প্রয়োজন মহারাজ পরিহাস ছলেই এ কথাগুলি বলেছিলেন। কিন্তু সরল সহজমতি স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করে তখনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন: আপনার অসঙ্গত কাজ ও তার সমর্থন করার জন্য তো লোকের অভাব নেই। সত্যই আমার জীবনের ধর্ম। কেন সত্যকে ত্যাগ করব? আপনি না হিন্দুরাজা? তবে কেন হিন্দু সন্ন্যাসীকে এইরূপ কথা বলতে পারছেন?

বীর বিবেকানন্দের নির্ভীক সত্যবাদিতা দেখে মহারাজ ধন্য হয়ে গেলেন।

একদিন মহীশূরের রাজা বললেন: স্বামীজী আপনার জন্য কিছু করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার আপনি তো কিছুই গ্রহণ করবেন না।

স্বামী বিবেকানন্দ তখন তাঁর ভারত ভ্রমণের কথা বললেন। জানালেন: আমাদের বর্তমান প্রয়োজন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করা। কিন্তু আজ বিদেশীর দ্বারে তাকিয়ে বৃথা ক্রন্দন করলে চলবে না। আজ বিদেশীর দিকে তাকিয়ে আমরা দেখতে পাই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি, শিল্প, ইত্যাদিতে তারা উন্নত। কিন্তু আমাদের এই ভারতবর্ষ—তার কি আছে? তবুও আছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান। সেই জন্য আমার ইচ্ছা হয় ভারতবর্ষের ধর্ম প্রচার করতে যাই পাশ্চাত্য দেশে। মহারাজা কুণ্ঠিত হয়ে জানালেন স্বামীজী যদি হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য বিদেশ যাত্রা করেন তা হলে মহারাজা স্বয়ং সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করবেন।

স্বামীজী স্মিতহাস্যে বললেন: আপনার কথা মনে থাকবে।

স্বামীজী এখানে আর রইলেন না। মহারাজা অশ্রুসজল নেত্রে বিদায় দিলেন।

বীর সাধক বিবেকানন্দের অপূর্ব ভারত ভ্রমণের কথা সমস্ত লেখা যায় না। বিরাট ও বিচিত্র তার কাহিনী। ব্যথা বেদনায়, দুঃখ আঘাতে, আনন্দে উল্লাসে তাঁর ভারত ভ্রমণ আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। এই ভ্রমণের মধ্য দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ দেখেছিলেন জনসাধারণের দারিদ্র্য অজ্ঞতা। তার অন্তর কেঁদে উঠেছিল সংগোপনে। পরাধীনতার মর্মবেদনা তাঁর অন্তরে বেজে উঠেছিল। স্বামীজী দেখতে পেয়েছিলেন আমাদের এই ভারতবর্ষ—দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দৈন্য দুঃখ, রোগে শোকে জর্জরিত।

কন্যাকুমারিকা পার হয়ে রামনাদের মধ্য দিয়ে ফরাসী অধিকৃত পণ্ডিচেরীতে এলেন স্বামী বিবেকানন্দ!

শ্রান্ত ও ক্লান্ত স্বামীজী!

এই সময়ের একটি ঘটনা! মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের ডেপুটি একাউন্টেণ্ট জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্যও সরকারী কাজে পণ্ডিচেরীতে এসেছিলেন। স্বামীজীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মাদ্রাজের দিকে যাত্রা শুরু করলেন।

মাদ্রাজে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের কথা ছড়িয়ে পড়লো। বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে।

শুধু তাই নয়, এলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্ররা আর গুণী অধ্যাপকের দল। রোজই স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে তাঁরা শুনতেন ধর্ম আর সাহিত্যালোচনার সারমর্ম।

দেখতে দেখতে মাদ্রাজে তাঁর গুণগ্রাহীর দলের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে লাগলো। যুব সম্প্রদায় তাঁকে গুরু রূপে বরণ করে নিলো!

মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ নাস্তিক, খৃষ্টান কলেজের অধ্যাপক সিঙ্গারু ভেলু মুধালিয়র স্বামী বিবেকানন্দের কথা শুনলেন।

এই সময়েরই ঘটনা!

বিজ্ঞানাধ্যাপক সিঙ্গার ভেলু ামীজীর সঙ্গে তর্ক করছেন। অধ্যাপকের বিশ্বাস ছিল ামীজীকে তাঁর যুক্তিজালে পরাজিত করবেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য! স্বামী বিবেকানন্দের মুখের দিকে চেয়ে নাস্তিক, খৃশ্চিয়ান কলেজের অধ্যাপক যেন অন্য জগতে চলে গেলেন।

আশ্চর্য এই অধ্যাপক! তিনি স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। পরবর্তী জীবনে আমরা দেখেছি স্বামীজী যখন আমেরিকায় ছিলেন তখন নব প্রতিষ্ঠিত 'প্রবুদ্ধ ভারতের' সম্পাদনার কাজ গ্রহণ করেন অধ্যাপক ভক্তপ্রাণ মুধালিয়র।

আর এই সময়েই তখন দেখা দিল পূর্ব তোরণে আশার আলো। খবর এসেছে শিকাগো মহামেলার অঙ্গ স্বরূপ এক বিরাট ধর্ম সভার আয়োজন চলছে। পৃথিবীর সমস্ত রকমের ধর্ম সম্প্রদায়ের মুখপাত্ররূপে প্রতিনিধিদের যাওয়ার তোড়জোড় চলেছে

কিন্তু এই ভারতবর্ষ থেকে কে নিয়ে যাবেন সেই আশার বাণী? কে শোনাবেন জাগরণের সেই অভয় বাণী? হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি কে হবেন?

এই নিয়ে আলোচনা চলছে! স্বামীজীর মাদ্রাজী শিষ্যরা ঠিক করলেন বিবেকানন্দকে ভারতের প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠাবেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বললেন: "ভাইগণ! শ্রীশ্রীজগন্মাতার ইচ্ছা হলে তিনিই আমাকে পাঠাবেন।"

হায়দরাবাদে স্বামীজী এসেছেন। স্বামীজী স্টেশনে এসেই দেখতে পেলেন কী বিশাল জনতা তাঁকে দেখার জন্য সমবেত হয়েছে। শুধু কি তাই? স্বামীজী দেখলেন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমাবেশ। রাজা শ্রীনিবাস রাও, মহারাজ রম্ভারাও বাহাদুর, পণ্ডিত রতনলাল, শ্যামসুম উলেমা সৈয়দ আলী বিলগ্রামী, নবাব ইমাদজঙ্গ

রায় হুকুম চাঁদ এম. এ, প্রভৃতির সাথে স্বামীজীকে পরিচয় করিয়ে দিলেন স্টেশনে ইনজিনিয়র মধুসূদন চ্যাটার্জী।

পরিব্রাজক বিবেকানন্দকে এর পর দেখা গেল নিজাম বাহাদুরের প্রাসাদে।

নবাব বাহাদুরের হিন্দুধর্মের প্রতি ছিল অগাধ বিশ্বাস। শুধু তাই নয় হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ভ্রমণ করেছিলেন নবাব বাহাদুর।

স্বামীজীকে ডেকেছেন নবাব বাহাদুর। ধর্ম নিয়ে আলোচনা উঠল। হিন্দুধর্ম, মুসলমান ধর্ম, ও খৃস্ট ধর্ম আলোচনা করতে গিয়ে স্বামীজী বললেন: সভ্যজগতের সামনে আজ আমাদের প্রয়োজন বেদান্ত শাস্ত্র সহায়ে ধর্মের প্রকৃত সত্য প্রচার।

নবাব বাহাদুর তাই শুনে বললেন: স্বামীজী আপনার যাওয়া উচিত। আর আমার সামান্য উপহার এই একসহস্র স্বুবর্ণ মুদ্রা আপনি গ্রহণ করুন।

স্বামী বিবেকানন্দ বললেন: এর আগেও আমার পরম বন্ধু মহীশূরের মহারাজ বাহাদুর শিষ্য রামনাদের রাজা আমাকে পাশ্চাত্য দেশে যাবার জন্য অর্থ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নবাব বাহাদুর এখনও সে সময় আসেনি। যদি ভগবানের আদেশ পাই সেদিন আপনাকে বলব।

নির্লোভ ও তপস্বী সাধক বিবেকানন্দ!

হায়দরাবাদ থেকে ফিরে আবার এলেন মাদ্রাজে।

মাদ্রাজে তখন চলেছে স্বামীজীকে শিকাগো ধর্ম সভায় পাঠাবার প্রস্তুতি! অর্থ সংগ্রহের জন্য ভক্তরা চলেছে হায়দরাবাদ, মহীশূর ও অন্যান্য স্থানে।

স্বামী বিবেকানন্দ বললেন: যদি আমার আমেরিকা গমন

একান্তই মায়ের ইচ্ছা হয় তা হলে আমাকে যেতেই হবে। কিন্তু জনসাধারণের মত আছে কিনা তা আমার জানা দরকার। তোমরা কেবল মাত্র রাজা-মহারাজাদের সাহায্য গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হয়ো না, জনসাধারণের কাছে যাও, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কর। তাদের মত নাও, হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হয়ে যেতে পারি কিনা।

স্বামী বিবেকানন্দের এই কথা শুনে তখনই মাদ্রাজী যুবকরা দলে দলে ছুটে গেল দ্বারে দ্বারে।

স্বামীজী ভারতবর্ষের আত্মার আত্মীয়। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের জাতির প্রেরণায় এগিয়ে চলেছেন সুদূর পাশ্চাত্য দেশে! স্বামীজী স্বপ্ন দেখলেন স্বয়ং ঠাকুর পরম করুণাময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে বলছেন—ওরে নরেন যা, পশ্চিমে যা। তোর জন্যে সবাই অপেক্ষা করছে। একি স্বপ্ন না সত্য, তাই বা কে জানে?

স্বামীজীর মনে সংশয় রইল না। যাবার জন্য তিনি তৈরী হলেন।

দিন আগত ঐ।

বিবেকানন্দ এবার চলেছেন দূর দেশে শিকাগো শহরে। তখনকার কালে বিদেশীর চোখে ভারতীয়রা ছিল অসভ্য আর অশিক্ষিত--এই ভ্রান্ত ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করতে হবে। কাজেই স্বামীজী চলেছেন সেই অভয় অমৃত বাণীকে সফল করতে!

সেদিন ছিল ১৮৯৩ সালের ৩১শে মে।

এবার আমরা ফিরে তাকাব স্বামী বিবেকান্দের অমৃতময়

জীবনের সত্য সাধনার দিকে। আমরা দেখেছি তাঁর কাজে ও চিন্তায় ভারতবর্ষের কোটি কোটি দরিদ্র, অজ্ঞান আত্ম-বিস্মৃত জনসাধারণের জন্য কি অসীম আকুলতা। তিনি শিক্ষা প্রসার প্রসঙ্গে বলেছেন: আদর্শ শিক্ষা দিতে হবে, পুঁথিগত শিক্ষা নয় এমন শিক্ষা যে হবে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত আর সেই শিক্ষায় ধর্ম বা বর্ণের গোঁড়ামী থাকবে না!

শুধু তাই নয় স্বামীজী বলতেন: ভারতের প্রত্যেকটি মানুষকে দিতে হবে মস্তিষ্কের শিক্ষা, সংযমের শিক্ষা, আক্ষরিক জ্ঞান, শিল্প বাণিজ্য ও আধ্যাত্মবাদের শিক্ষা। আর সেই শিক্ষার উপর নির্ভর করছে ভারতের ছিন্ন-ভিন্ন জাতি সমূহকে এক অভিন্ন ও অখণ্ড মহাজাতি রূপে স্বধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার এক অসাধারণ শক্তি!

স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়ই বলতেন: "ভাততে একটা জিনিসের বড়ই অভাব, একতা বা সংহতশক্তি। তা লাভ করবার প্রধান রহস্য হচ্ছে আজ্ঞানুবর্তিতা। হিংসাই সমস্ত দাস জাতির ধ্বংসের কারণ। এ হতেই আমাদের জাতির সর্বনাশ। ইহা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য!" তাই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল: "ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী একই সঙ্গে এগিয়ে চলেছিল তাঁর কর্মের মধ্য দিয়ে।

কাজেই অতীতের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখতে পাই বিদেশী শাসনের পদতলে ভারতবাসী দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাদের ছিল না আশা। ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের মনে ছিল নিঃশব্দতার জলতরঙ্গ। কিন্তু জাগরণের মন্ত্র বাণী শুনিয়ে ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

তিনি বলেছিলেন :

"ওগো বিশ্ব, শোনো আমরা অমৃতের সন্তান। আমরা মানুষ, আমরা অমৃতময় ঈশ্বরের সন্তান। আমরা শক্তির অধিকারী। আমরা চিরকালের জন্য জেগে আছি। আমরা অমর। আমাদের মৃত্যু নেই, ক্ষয় নেই, ধ্বংস নেই, বিনাশ নেই।"

আর আজ আমাদের স্মরণ পথে উদিত হয় স্বামীজীর সেই অভয় বাণী : "আমি মানুষ, আমি মহৎ, আমি ভাগবানের সৃষ্টি, আমি অমৃতের সন্তান, আমি মরবো না, আমি মরতে পারবো না। ব্রাহ্মণ, মুচি, মেথর সকলকেই আজ শিরদাঁড়া উঁচু করে বলতে হবে—'শিবোহহং'। আমিই শিব, অশিবকে, অমঙ্গলকে, অসুন্দরকে ধ্বংস করবার জন্যই আমার জন্ম।"

এমন করে পরাধীন ঘুমন্ত জাতিকে কেউ শোনায় নি জাগরণের মন্ত্র বাণী।

তিনি বলেছিলেন :

"হে ভারত ভুলিও না, তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দয়মন্তী। ভুলিও না তোমার উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর। ভুলিও না তোমার ধর্ম, তোমার জীবন। ভুলিও না নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।"

প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়ছে ভারতের নির্যাতিতা, অবলা নরীর অবরোধের কথা। অভিশপ্ত প্রাণকে জাগরণের শক্তি মন্ত্রে উদ্বোধিত করবার জন্য মার্গারেটকে ভারতের বুকে নিয়ে এসেছিলেন বীর বিবেকানন্দ।

সেই মার্গারেটই হলেন ভগিনী নিবেদিতা! আমেরিকায় নারী জাতির উত্থান দেখে স্বামীজী আশ্চর্য হয়েছিলেন। তাই স্বামীজী বলেছেন :

"এদের মেয়েদের দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম বাবা। আমাকে

বাচ্চাটির মতন ম্যঠে-ঘাটে, দোকানে, হাটে নিয়ে যায়। সব কাজ করে, আর আমি তার সিকিও করতে পারি না। এরা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—এরা সাক্ষাৎ জগদম্বা। এদের পূজো করলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। আরে রাম বল, আমরা কি মানুষের মধ্যে? এইরূপ মা জগদম্বা যদি এক হাজার আমাদের দেশে তৈরী করতে পারি, তবে নিশ্চিন্ত হয়ে মরবো। একি মেয়েরে বাবা। মদ্দগুলোক কোণ ঠেসে দেবার যোগাড় করেছে। মদ্দগুলো হাবুডাবু খেয়ে যাচ্ছে।"

স্বামীজী মনে প্রাণে অনুভব করেছিলেন যুগ যুগ ধরে ভারতের বুকে নারীরা অবেহেলিতা।

পরিব্রাজক অবস্থায় আলমোড়ায় থাকাকালীন স্বামী বিবেকানন্দ খবর পেলেন তাঁর জনৈক বিবাহিতা ভগিনী শ্বশুর বাড়ীর অসহ্য অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করছেন। এরকম দুর্ঘটনায় স্বামী বিবেকানন্দ অভিভূত হলেন। পরবর্তী সময়ে যখন আমেরিকায় এলেন, তখন নারী সমাজের তুলনামূলক বিচার করে দেখলেন আমাদের দেশের নারী সমাজ আমেরিকার নারী সমাজের তুলনায় কত পরাধীন। আমেরিকার নারী প্রগতি দেখে স্বামীজী মুগ্ধ হয়েছিলেন। আমরা দেখেছি অনেক বিদুষী ও সম্ভ্রান্ত ঘরের আমেরিকার মহিলারা স্বামীজীর শিষ্যা হয়েছিলেন।

একদিন আক্ষেপ করে স্বামীজীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল, তিনি বলেছিলেনঃ এ সতী-সাবিত্রীর দেশ, পুণ্য ক্ষেত্র ভারতে এখনো মেয়েদের যেমন চরিত্র, সেবাভাব, স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখলুম না। এমন সব আধার পেয়েও তোরা তাদের উন্নতি করতে পারলি নে।"

তবুও স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল দেশকে শক্তি মন্ত্রে জাগানো।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে চিঠি লিখলেন সাধক শিবানন্দকেঃ 'মা ঠাকুরণ যে কি বস্তু বুঝতে পারিনি, শক্তি

বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন? শক্তিহীন কেন? শক্তির সেখানে অবমাননা বলে। মা ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জন্মাবে। আমেরিকা ও ইউরোপে দেখেছি শক্তির পূজা!……আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন দিন সব বুঝতে পারছি।

বীর সাধক বীর সন্ন্যাসী স্বামীজী এই ঘুমন্ত ভারত ললনাদের জাগাতে হবে এই মন্ত্র নিয়ে পাশ্চাত্যের নারীদের এদেশে এনেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মার্গারেট নোবেল অন্যতমা। তাঁর জীবন গড়ে উঠছিল সেখানকার শিক্ষা আর দীক্ষার মধ্য দিয়েই। তবুও সেই মহিয়সী নারী স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আর অলৌকিকশক্তি দেখে মুগ্ধ হলেন। স্বামীজীর অমৃতময় বাণী তাঁর প্রাণে সাড়া জাগালো। মহান কর্মব্রতের তাগিদে তিনিও এগিয়ে এলেন।

লণ্ডনে থাকার সময়ে স্বামীজী মার্গারেটকে বললেন: "স্বদেশের স্ত্রী শিক্ষার একটা পরিকল্পনা করেছি, মনে হয় তোমার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাবো। ভারতের হাজার হাজার মেয়ে প্রতীক্ষা করে আছে, পশ্চিমের একটি মেয়ে যদি পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জন্য বোঝে, তাদের পথ দেখিয়ে দেয়, তা'হলে নিশ্চয়ই তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। ভারতবর্ষ আজও মহিয়সী নারী সৃষ্টি করতে পারেনি। অন্য দেশের কাছ থেকে এ জিনিস তাদের ধার করে আনতে হবে। তোমার শিক্ষা, আন্তরিকতা, পবিত্রতা, বিপুল মানব প্রেম, সংকল্পের দৃঢ়তা,—সবচেয়ে বড় কথা তোমার রক্তের তেজ—এই সব আছে বলে এদেশের জন্যে যেমন মেয়ে চাই, তুমি ঠিক তেমনি"।

স্বামীজীর এই কথায় সাড়া দিয়েছিলেন আয়ার্ল্যাণ্ডের তরুণী

মার্গারেট। আগেই বলেছি ইনিই হচ্ছেন সর্বজন মহিয়সী ভগিনী নিবেদিতা !

স্বামী বিবেকানন্দের অমৃতময় পুণ্য বাণী একসঙ্গে তুলে ধরা যায় না। তবুও তাঁর বজ্রনিনাদের কণ্ঠে থেকে যে বাণী আমাদের মনের পটে গাঁথা রয়েছে, সেগুলি থেকে কিছু সংখ্যক মাত্র চয়ন করে পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি।

তিনি আমাদের অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত করে এই কথা বলেছেন বার বার ঃ "এসো মানুষ হও। গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তা হলে এসো, আমরা ভাল হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। পেছনে চেও না। অতিপ্রিয় আত্মীয় স্বজন কাঁদুক, পেছনে চেও না, সামনে এগিয়ে যাও।... মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয়।"

পর পদানত ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তোলেন স্বামীজী তাঁর গুরু গম্ভীর জাগরণী মন্ত্রে।

তিনি বললেন ঃ—"ওঠো জাগো, যতদিন না লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবো, ততদিন থেমো না। ধর্ম মানে ত্যাগ আর কিছু নয়।"

"এ দেশে আগে গ্রাউণ্ড (জমি) তৈরী করতে হবে। প্রথমত কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন—যারা নিজেদের সংসারের কথা না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারবে। আমি মঠ স্থাপন করে কতকগুলি বালক সন্ন্যাসীকে ঐরূপে তৈরী করছি। শিক্ষা শেষ হলে এরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে তাদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বলতে পারবে। ঐ অবস্থার উন্নতি কিসে হবে, সে বিষয়ে উপদেশ দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মহান সত্যগুলি সোজা কথায় জলের মত পরিষ্কার করে তাদের বুঝিয়ে দেবে

তিনি বলছেন আরও: "তোরা কোমর বেঁধে লেগে যা, সংসার ফংসার করে কি হবে? তোদের এখন কাজ হচ্ছে দেশে দেশে, গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে দেশের লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, আর আলস্য করে বসে থাকলে চলছে না। শিক্ষাহীন, ধর্মহীন, বর্তমান অবনতির কথা তাদের বুঝিয়ে দিয়ে বলতেন 'ভাই সব, ওঠ জাগো কতদিন আর ঘুমুবে?...জগতে যখন এসেছিস তখন একটা দাগ রেখে যা। ...একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে তো যাবিই, তা ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে মরা ভাল...লেগে যা! দেরী করিসনি।

সুপ্ত, নিদ্রামগ্ন জাতির প্রাণে জাগরণের মন্ত্র শুনিয়ে ও কাজের মধ্য দিয়েই প্রমাণ করেছিলেন সর্বত্যাগী বীর সাধক বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দই বেদ-বেদান্ত উপনিষদ-গীতা প্রভৃতি ভারতীয় শাস্ত্র সাগর মন্থন করেছিলেন। আর তারই পরশে জাগিয়ে তুললেন এই ভারতের মানবদের সামনে এক বিরাট বিপ্লব। ভারতবাসীর কাছে তিনি এক নব জাগরণের বাণী শোনালেন।

সারা পৃথিবী জুড়ে যখন চলেছে অধর্ম আর অসত্য, তখনা স্বামীজী বজ্র কণ্ঠে বলেছিলেন: ওগো বিশ্ব, শোন, আমর অমৃতের সন্তান!

আর সেই বাণী শোনাবার জন্যই রিক্ত নিঃস্ব ভারতের প্রতিনিধি হয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম উচ্চারণ করে স্বামী বিবেকানন্দ গেলেন প্রাচ্য দেশে। ভারতের ধর্ম ও সকল ধর্মের সারই সত্য, আর এই ধর্মই হল বিশ্বধর্ম। যাত্রা সুরু করলেন ১৮৯৭ সালের ৩১শে মে।

এবার সেই ঘটনার কথাই অবতরণা করছি।

তার আগে একটা ঘটনা লিপিবদ্ধ করছি। পরিব্রাজক কালে স্বামী বিবেকানন্দ খেতড়ির রাজার আলয়ে এসেছিলেন, তখন খেতড়ি রাজ অপুত্রক ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে খেতড়ি রাজ অজিত সিংহ বলেছিলেনঃ আমার কোন সন্তান নাই, অর্থাৎ আমি অপুত্রক। আপনি আশীর্বাদ করুন, যেন আমার একটি পুত্র সন্তান হয়। আপনার আশীর্বাদ পেলে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

ধর্মপ্রাণ রাজার ভক্তি ও কাতরতায় স্বামীজীর প্রাণে করুণার সঞ্চার হল। প্রাণভরে আশীর্বাদ ক'রেছিলেন রাজাকে। স্বামীজীর সেই আশীর্বাদ সফল হয়েছিল।

তারপর আজ সেই শুভদিন। একদিন রাজাকে স্বামীজী আশীর্বাদ করেছিলেন। রাজা পুত্র সন্তানলাভ করেছেন। উৎসবে মুখরিত খেতড়ি আলয়।

স্বামীজী তখন মাদ্রাজে ছিলেন।

রাজপুত্রকে আশীর্বাদ করবার জন্য স্বামীজীকে আনাতে রাজা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পাঠালেন প্রাইভেট সেক্রেটারী জগমোহনলালকে।

মাদ্রাজে এসেছেন জগমোহন।

স্বামীজী সব শুনলেন, বললেনঃ দেখ জগমোহন এদিকে আমেরিকায় যাত্রার সব ঠিক হয়েছে। কি করে যাই বল?

কিন্তু জগমোহন কোন কথাই শুনলেন না। বললেনঃ দয়া করে স্বামীজী একদিনের জন্য চলুন। আপনার পথপানে চেয়ে আছেন রাজাজী। আপনি না গেলে তিনি নিজেই ছুটে আসবেন। আপনার বিদেশ যাত্রার ব্যবস্থা আমরাই করে দেব।

অগত্যা স্বামীজীকে যেতে হল।

মাদ্রাজের শিষ্যদের আশীর্বাদ জানিয়ে এবং তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বামীজী খেতড়ি যাত্রা করলেন।

স্বামীজী পৌঁছুলেন খেতড়িতে। রাজার প্রাণে বিপুল আনন্দ।

রাজ্যে উথলো উঠলো আনন্দের বন্যা। আজ এসেছেন বীর বিবেকানন্দ। দুদিন পরেই চলে যাবেন সুদূর প্রাচ্যে!

অবশেষে এলো সেই দিন!

বোম্বেতে এসেছেন স্বামীজী! সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতন এসেছেন রাজার সেক্রেটারী জগমোহনলাল।

বোম্বাইতে এসেই স্বামীজীকে মূল্যবান গৈরিক পরিচ্ছদে ভূষিত করলেন জগমোহন।

যাত্রার সব বন্দোবস্ত করা হয়েছে। মাদ্রাজ থেকে ছুটে এসেছেন স্বামীজীর প্রিয় শিষ্য আলসিঙ্গা পেরুমল।

জগমোহলাল, আলসিঙ্গার চোখে জল। তাঁরা দেখলেন পরাধীন ভারতবর্ষের সর্বত্যাগী বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দেরও চোখে জল। এ চোখের জল ব্যর্থ হবার নয়। জগতের সর্বহারাদের জন্য স্বামীজীও এই চোখের জলের প্রত্যেকটি অশ্রুবিন্দু সার্থক হয়ে উঠবে তাঁরই জয়গানে।

ডেকের উপর দাঁড়িয়ে স্বামীজী। মনে মনে বললেন: হায় আমার ভারতবর্ষ!

ডেকে দাঁড়িয়ে অশ্রুসজল নেত্রে ভারতের তটভূমির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তিনি দেখলেন মহিমময় ভারতবর্ষ! তাঁর অন্তর কেঁদে উঠল, হায়! পরাধীন ভারতবর্ষ, পর পদদলিত তুমি! একসঙ্গে তাঁর অন্তরে জেগে উঠলো।এই নিপীড়িত—ভারতবাসীর কোটি কোটি মানুষের বেদনা!

ভারতের মুক্তি কল্যাণ কামনায় চলেছেন বিশ্বজয়ী বীর বিবেকানন্দ!

জাহাজ চলেছে। বোম্বাই হতে সিংহল, পিনাং, সিংগাপুর,

হংকং-এর পথে। তারপর ক্যান্টন নাগাসিকি, ওসাকা কিওটো ও টোকিও দেখে স্বামীজী এলেন স্থলপথে ইয়োকোহোমায়।

সুদূর প্রাচ্যের এই সমস্ত দেশগুলির উপর তিনি অনুভব করলেন প্রাচীন আর্য সভ্যতার প্রভাব। এশিয়ার আধ্যাত্মিক ঐক্যতাও তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করলেন।

ইয়োকহোমা থেকে স্বামীজী চলেছেন জাহাজেই। প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে প্রাচ্য-ভূখণ্ডকে পিছনে ফেলে দিয়ে বীর সন্ন্যাসী চলেছেন প্রতীচ্যের সামনে।

প্রশান্ত মহাসাগর পার হবার পর জাহাজে বসে বিবেকানন্দ অনুভব করলেন নিদারুণ শীত। শীতের কোন পোশাকও তাঁর সঙ্গে নেই। শীতে কাতর তিনি। জাহাজ কানাডার অন্তর্গত ভাংকুভারে এসে গেলো।

তারপর ট্রেণযোগে কানাডার মধ্য দিয়ে জুলাই মাসের মাঝা-মাঝি স্বামীজী এসে নামলেন শিকাগোতে।

শিকাগোতে এলেন স্বামীজী!

এখানে তাঁর কোন পরিচিত লোক নেই. এমনকি তার কোন পরিচয় পত্র ছিল না। অবশেষে এক হোটেলে এসে আশ্রয় নিলেন। তারপর অসহায় অবস্থায় রিক্ত নিঃস্ব বিবেকানন্দ বারো দিন ধরে বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে ঘুরে ঘুরে শিকাগোর বিশ্ব প্রদর্শনী দেখলেন।

খোঁজ নিতে গেলেন প্রদর্শনীর অনুসন্ধান দপ্তরে. কবে বসবে ধর্ম সম্মেলন। খবর নিয়ে জানলেন সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের আগে ধর্ম সম্মেলন সুরু হবে না? শুধু তাই নয় নির্ভরযোগ্য পরিচয় পত্র না দিলে কেউ সভার প্রতিনিধি হতে পারবে না, তা ছাড়া প্রতিনিধি নির্বাচনের শেষ তারিখ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ তখন নিরুপায়। কী করবেন? অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে দেখতে লাগলেন যেন, সব কিছু কী ব্যর্থ হয়ে যাবে? তাঁর কোন পরিচয় পত্র নেই, আর সম্মেলন পর্যন্ত থাকতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন তাও তাঁর কাছে নেই।

স্বামীজী চিন্তিত হয়ে উঠলেন তবুও আশা ছাড়লেন না। ঠিক করলেন শেষ চেষ্টা করতেই হবে!

এদিকে এখানকার হোটেলে বেজায় খরচ। তাই খরচা কমাবার জন্য তিনি যাত্রা করলেন বোস্টনে।

বোস্টনের পথে ট্রেনের মধ্যেই আলাপ হয়ে গেলো স্বামীজীর এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে। তিনি হচ্ছেন ব্রিজি মেডেজের একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা। শুধু তাই নয়, এই ভদ্রমহিলা স্বামীজীকে সঙ্গে করে নিয়ে যান তাঁর বাড়ীতে। যার ফলে স্বামীজীর অনেক সুবিধা হয়েছিল। স্বামীজীর রোজ এক পাউণ্ড করে যা খরচ হচ্ছিল তা বেঁচে গেলো। আর ভদ্রমহিলার মনে কি আনন্দ ভারতের তরুণ যুবক সাধক বীর বিবেকানন্দের দর্শন পেয়ে।

হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার প্রসিদ্ধ অধ্যাপক জে. এইচ্ রাইট স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হলেন। তিনি বললেন: স্বামীজী! ধর্ম সভায় আপনি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হয়ে যান।

স্বামীজী বললেন: আমার তো কোন পরিচয় পত্র নেই।

মিঃ রাইট হেসে জবাব দিয়েছিলেন: স্বামীজী, আপনার কাছে পরিচয় চাওয়া আর সূর্যের কিরণ দেওয়ার অধিকার আছে কিনা তা বলা একই কথা।

মিঃ রাইট প্রসন্ন ও শ্রদ্ধা চিত্তে প্রতিনিধি নির্বাচন সভার প্রেসিডেন্টকে লিখলেন: "ইনি এমন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি যে, পৃথিবীর সকল অধ্যাপকদের পাণ্ডিত্য এক করলেও এঁর সমকক্ষ কেউ নেই!"

মিঃ রাইট শুধু চিঠি লিখেই তাঁর কাজ শেষ করলেন না। শিকাগো পর্যন্ত স্বামীজীকে একখানা টিকিট কিনে দিলেন। আর সেই সঙ্গে ধর্ম সম্মেলনের প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক কমিটর কাছেও একটি পত্র লিখে দিলেন তিনি।

অন্ধকার থেকে এলো আশার আলো। নতুন আশা নিয়ে স্বামীজী শিকাগো যাত্রা করলেন। ট্রেন এসে থামলো রাত্রে। রাত্রের দুর্জয় শীতে তাঁর সমস্ত শরীর তখন কাঁপছে। কি করবেন, কোথায় যাবেন, কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। যার কাছে যান ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয় সবাই। এ যে কালা আদমী। তিনি শ্বেতাঙ্গ নন, এই তাঁর অপরাধ। কারও কাছে কোন সাহায্য না পেয়ে সেই অন্ধকার রাতে তরুণ সাধক সন্ন্যাসী বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ স্টেশনের এক কোণে একটা বড় খালিবাক্সের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। দুর্জয় শীতের হাত থেকে কোন রকমে রক্ষা পেলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাইট সাহেবের লেখা চিঠিটি তিনি হারিয়ে ফেললেন।

রাত্রি প্রভাত হতেই বিবেকানন্দ বেরিয়ে পড়লেন পথের সন্ধানে। কিন্তু এই বিপদসস্কুল পথে যেতে যেতে কী পেলেন তিনি? পেলেন অবমাননা ও লাঞ্ছনা। যেখানেই আশ্রয় চেয়েছেন সেখানেই তাঁকে নিরাশ হতে হয়েছে। কালা আদমীদের স্থান নেই। বাড়ীর চাকরদের দিয়ে অপমান করা হয়েছে, মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তবুও বীর বিবেকানন্দ অটল, তাঁকে জয়ী হতেই হবে।

ক্লান্ত, অবসন্ন, পথশ্রান্ত স্বামীজী। পথের একধারে বসে আছেন। সহসা যেন আশার এক আশ্চর্য আলোর পরশ পেয়ে তিনি জেগে উঠলেন। রাস্তার ওপারের এক বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে এক ভদ্রমহিলা সুমিষ্ট কণ্ঠে বললেন স্বামীজীকে: মহাশয় আপনি কি ধর্ম মহাসভার প্রতিনিধি?

স্বামীজী বললেন: হ্যাঁ, কিন্তু আমি ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছি বলেই এই অবস্থা। সেই ভদ্রমহিলা আর স্থির থাকতে পারলেন না। চেয়ে দেখলেন তিনি সন্ন্যাসীর দিকে। অনিমেষ দৃষ্টি নিয়ে মাতৃসমা ঐ রমনী মুগ্ধ হয়ে বললেন: আসুন আমার সঙ্গে।

স্বামীজীকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন ভদ্রমহিলা।

আর স্বামীজী এই ভদ্রমহিলাকে 'মা' বলে ডাকলেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর, সোমবার, পৃথিবীর ধর্ম ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ক্ষেত্র হয়ে।

সমস্ত জগতে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার শুভ সূচনা। আর স্বামী বিবেকানন্দই ধর্ম মহাসম্মেলনে যে কথা শোনালেন তা ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে রইল।

মহাসভা খুলবার দিন সকাল বেলায় বিভিন্ন প্রতিনিধিরা শিল্প প্রাসাদ ভবনে এসেছেন। সর্ব জাতির লোকদের সমাগম হয়েছে। নীচে একটি হল। আর দেখা যাচ্ছে আমেরিকার বাছা বাছা ৬।৭ হাজার সুশিক্ষিত নরনারীরা এসেছেন। প্লাটফর্মের উপরে পৃথিবীর সর্বজাতির পণ্ডিতদের সমাবেশ!

শুরু হল ধর্ম সম্মেলন।

বিভিন্ন প্রতিনিধিরা সকলেই নিজ নিজ ধর্মের পরিচয় দিয়ে সংক্ষেপে বক্তৃতা দিলেন।

এবার স্বামী বিবেকানন্দের পালা। তাঁর সুসজ্জিত গৈরিক বসনের দিকে শ্রোতারা বিস্ময় দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে। স্বামীজী কোন সম্প্রদায়ের হয়ে আসেননি, তিনি ছিলেন সমগ্র ভারতের সনাতন বৈদিক ধর্মের প্রতিনিধি স্বরূপ।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরু গম্ভীর কণ্ঠে 'হে আমেরিকাবাসী ভগ্নি ও ভ্রাতৃবৃন্দ' বলে সভাকে সম্বোধন করলেন। স্বামীজীর মুখে

এই কথা শুনে সবাই চমকে উঠল, কি বিপুল দুর্জয় শক্তি—যা সকলের অন্তরে সাড়া জাগাল। নতুন কথা যেন, কি বিপুল আকুলতা, হে আমার আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতৃবৃন্দ। এই কথা শোনা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে কি বিপুল উদ্দীপনা, চারিদিক থেকে বিপুল উচ্ছ্বাস, তুমুল করতালি। থামে না. যেন সমুদ্রের সফেন সঙ্গীত, সাগরের ঢেউ লেগে সমস্ত জগত আজ কান পেতে শুনছে নতুন যুগের নতুন বাণী! স্বামী বিবেকানন্দের এই সম্বোধনে আমরা পেলাম বিশ্বভ্রাতৃত্বের বীজ, বিশ্ব-মানবতার চেতনার নতুন সুর, বৈদিক ঋষির বাণী ও সৌভ্রাত্রের পবিত্র পরশ। এর আগে কেউ এমন করে প্রাণের আবেগ দিয়ে একথা বলেনি। স্বামী বিবেকানন্দই একমাত্র মানবজাতিকে ভাই ও বোন বলে ডেকেছেন। আজ সেই মন্ত্র যেন ক্ষণেকের জন্য সমস্ত জগতকে এক করে দিলো। হাজার হাজার নরনারীর মনে এই কথাই জেগে উঠল 'মানুষ মানুষের ভাই'।

তারপর স্বামীজী কয়েক মিনিট চুপ করে রইলেন। সভা যখন স্তব্ধ হল, স্বামীজী ক্ষুদ্র ভাষণ দিলেন।

স্বামীজীর কথাতে ছিল উদার ও বিশ্বজনীন ভাবপূর্ণতা। স্বামীজী বললেন ঃ যে ধর্ম জগতে চিরদিনই সমদর্শন ও সর্ববিধ মত গ্রহণের বিষয় শিক্ষা দিয়ে আসছে, আর আমি সেই ধর্মভুক্ত বলে নিজেকে ধন্য মনে করি। আমরা যে কেবল অন্য ধর্মাবলম্বীকে সমদৃষ্টিতে দেখি তা নয়, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করে থাকি।...যে জাতি পৃথিবীর সকল ধর্ম ও জাতির যাবতীয় ত্রস্ত উপদ্রুত ও আশ্রয়-লিপ্সু জনগণকে চিরকাল অকাতরে আশ্রয় দিয়ে আসছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করি। যে বৎসর রোমকদিগের ভয়ঙ্কর উৎপীড়নে ইহুদী জাতির পবিত্র দেবালয় চূর্ণীত হয়, সে বৎসর তাদের কিয়দংশ দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় লাভার্থে এলে, আমার জাতিই সাদর হৃদয়ে

তাদের গ্রহণ করেছিলেন, আমি সেজন্যও নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। জেরোয়াস্তারের অনুগামী সুবৃহৎ পারসীক জাতির অবশিষ্টাংশকে যে ধর্ম আশ্রয় দিয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত যে ধর্ম তাঁদের প্রতিপালন করেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত।"

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব 'যত মত, তত পথ'-এর যে সমন্বয় বাণী বলেছিলেন, সেই মহান্ সত্যের বাণীর কথাই দীপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন বিবেকানন্দ।

স্বামীজী বলেছিলেন: সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতা এ সবের ফল স্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে অনেককাল ধরেই আয়ত্তাধীন করে রেখেছে। আমি সর্বতোভাবে এই আশা করি যে, এই ধর্মসমিতির সম্মানার্থে আজ যে ঘণ্টাধ্বনি করা হল, সেই ঘণ্টা নিনাদই ধর্মোন্মত্ততা এবং তরবারী কুতর্কাদি দ্বারা উৎপন্ন বহুবিধ দৌরাত্ম্য এবং একই চরম লক্ষ্যে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিধ অসদ্ভাবের সমূলে নিধন সমাচার ঘোষণা করুক।"

বিভিন্ন অধিবেশনে স্বামীজী যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে সত্য সাধনার কথাই তিনি বলেছিলেন।

পঞ্চম দিনের ধর্মসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মতদ্বৈধ ও মনান্তরের কারণ বোঝাবার জন্য কূপবাসী ও সমুদ্রবাসী দুটি ভেকের গল্পের অবতারণা করে জানালেন! "হে ভ্রাতৃগণ এরূপ সংকীর্ণ ভাবই আমাদের মতভেদের কারণ ঘটেছে। আমি একজন হিন্দু, আমি আমার নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসে আছি এবং একে সমগ্র জগৎ বলে মনে করছি। খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী তাঁর নিজের ক্ষুদ্র কূপে উপবিষ্ট আছেন ও তাকেই সমগ্র জগৎ বলে মনে করছেন। হে আমেরিকাবাসীগণ, আপনারা যে আমাদের এই ক্ষুদ্র জগৎগুলির অবরোধ ভাঙ্গবার জন্য বিশেষ যত্নশীল হয়েছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ

দিই। আশা করি ঈশ্বর ভবিষ্যতে আপনাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্পাদনে সাহায্য করবেন।

এই ধর্ম মহাসভা সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের বক্তারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ভগবানের মহিমার কথাই উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু বীর বিবেকানন্দ সকল ধর্মের ভগবানের কথাই বলেছিলেন। সার্বভৌম বিশ্বধর্ম গড়ে উঠবে তাই তিনি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে জানিয়েছিলেনঃ "সেই ধর্ম, যে অনন্ত ভগবানের বিষয় উপদেশ করবে, সে রূপ অনন্ত হবে। সেই ধর্মসূর্য কৃষ্ণভক্ত বা খৃষ্টভক্ত, সাধু, অসাধু সকলেরই উপর সমভাবে স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করবে। সেই ধর্ম শুধু ব্রাহ্মণ ধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম বা খৃষ্টিয়ান ধর্ম বা মুসলমান ধর্ম হবে না, পরন্তু সকলেরই সমষ্টি স্বরূপ হবে, অথচ তাতে উন্নতির অনন্ত পথ মুক্ত থাকবে। সে ধর্ম এতদূর সার্বভৌম হবে যে, তা অসংখ্য প্রসারিত হস্তে পৃথিবীর যাবতীয় নরনারীকে সাদরে আলিঙ্গন করবে...এবং তার সমুদয় শক্তি সমস্ত মনুষ্য-জাতিকে স্ব স্ব দেব ভাবোপলব্ধি করতে সহায়তা করবার জন্যই সতত নিযুক্ত থাকবে।...'প্রত্যেক ধর্মেই ঈশ্বর আছেন'—সমস্ত জগতে এ সত্য ঘোষণা করার ভার আমেরিকার জন্যই ছিল।"

স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের নিন্দা বা সমালোচনা করেননি। কোন ধর্মকেই ছোট বলেননি। তাই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল—প্রাচ্য দেশের ধর্ম সম্মেলনে তিনি বলেছেনঃ খ্রীস্টানকে হিন্দু হতে হবে না, অথবা হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রীস্টান হতে হবে না। কিন্তু প্রত্যেক ধর্মকেই নিজের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে অপরের ভাব হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, ক্রমশঃ উন্নত হতে হবে। উন্নতি বা বিকাশের ইহাই একমাত্র নিয়ম।"

ধর্ম মহাসম্মেলনে বীর সাধক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দকে অভিনন্দিত করলেন সবাই। একদিনেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর কথা ছড়িয়ে পড়লো আমেরিকায়।

স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্ম সমাজে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে বললেন ঃ 'অমৃতের অধিকারী' এই নামটি কেমন মধুর, কি আনন্দবর্ধক। হে ভ্রাতৃগণ! এই মধুর নামে তোমাদের আমি সম্বোধন করতে চাই। তোমরা অমৃতের অধিকারী। হিন্দুরা তোমাদের পাপী বলতে অস্বীকার করেন। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান। অমৃতের অধিকারী, পবিত্র ও পূর্ণ। তোমরাই এই মর্তভূমিতে দেবতা।

স্বামী বিবেকানন্দ মানবাত্মার মহিমা ঘোষণা করে বলেছিলেন ঃ সবাই অমৃতের পুত্র, জ্যোতির তনয়। তাঁর কথাতে জানিয়েছিলেন ভারতে ধর্মের অভাব নেই, একমাত্র অভাব অন্ন বস্ত্রের। পরাধীন ভারতের নিপীড়িত মানবদের প্রতিনিধি হয়ে জানাই ধর্ম ভারতের প্রকৃত অভাব নয়। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বললেন ঃ—"...দরিদ্র পৌত্তলিকদের উদ্ধার কল্পে তোমরা লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে মিশনারী প্রেরণ করছ, তাদের দেহ রক্ষা করে দুমুঠো অন্নের ব্যবস্থা করতে পার কি ?...ভারতবর্ষে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সময় সহস্র সহস্র বিধর্মী ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু হে—খ্রীস্টানগণ! তৎ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন তোমরা সমগ্র ভারতবর্ষে খ্রীস্টের ধর্ম মন্দির নির্মাণের জন্য ব্যস্ত, কিন্তু ভারতবাসীদের ধর্ম প্রচুর আছে, তারা শুষ্ক কণ্ঠে কেবল মাত্র অন্নের জন্য প্রার্থী হয়ে আছে। তারা অন্ন চাচ্ছে —পাচ্ছে প্রস্তরখণ্ড।...আমি আমার গ্রাসাচ্ছাদনহীন স্বদেশীয়গণের জন্য তোমাদের নিকট ভিক্ষা চাইতে এসেছি। কিন্তু খ্রীস্টানদের নিকট পৌত্তলিকদের জন্য সাহায্য লাভ করা যে কি দুরূহ ব্যাপার, তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করছি।...... ।"

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বতে শান্তি আসুক, এই কামনা করে সকল ধর্মের ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে দীপ্ত কণ্ঠে বললেন ঃ—

"যিনি হিন্দুর ব্রহ্ম, যিনি জরথুস্ত্র পন্থীদের অহুর মজদা, যিনি

বৌদ্ধদের বুদ্ধ, মুসলমানদের আল্লা, ইহুদীদের জিহোবা, যিনি খ্রীস্টানদের স্বর্গস্থ পিতা, তিনি আপনাদের এই মহৎ উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করাবার শক্তি দিন।"

ধর্ম মহাসভার শেষ দিনে স্বামী বিবেকানন্দ বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন :......ধর্ম মহাসভা যদি জগতকে কিছু দেখিয়ে থাকে, তাহা এই—পবিত্রতা, চিত্তশুদ্ধি, দয়া-দাক্ষিণ্য, মহানুভবতা—কোন ধর্ম সম্প্রদায় বিশেষের নিজস্ব নয়। প্রত্যেক ধর্মে উন্নত চরিত্র নরনারীর আবির্ভাব হয়েছে। এ প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেউ স্বপ্নেও ভাবেন যে, সকল ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে শুধু তাঁর ধর্মটি বেঁচে থাকবে, তা হলে তাঁকে আমি করুণার পাত্র মনে করি, তাঁর জন্য আমি বড়ই দুঃখিত এবং এ কথাও বলি যে, শীঘ্রই দেখবেন আপনার বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও সকল ধর্মের পতাকা শীর্ষে লিখিত হবে—'সমর নয় সহায়তা ; বিনাশ নয় গ্রহণ ; দ্বন্দ্ব নয় মিলন ও শান্তি।'

এই ধর্ম মহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু জাতির আত্ম-মর্যাদা বোধ জাগিয়ে তুললেন। শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ শোনালেন নতুন যুগের নতুন বাণী।

স্বামী বিবেকানন্দ যেন ভারতের গণজাগরণের নতুন চেতনার সূত্রপাত ঘটালেন, তাই তাঁর এই বিজয়ে সমগ্র ভারত পেল প্রাণ, সমগ্র বিশ্বের নরনারীরা উল্লসিত ও দীপ্ত হয়ে উঠল। পরাধীন ভারতবর্ষের মনে এলো এক পরম সত্য বাণী, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করল।

স্বামী বিবেকানন্দ হলেন বিশ্ব বরেণ্য। শিকাগো শহরের বিভিন্ন স্থানে তাঁর শত শত প্রতিকৃতি সাজানো হল। ভারতের হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের যশগানে মুখর হয়ে উঠল আমেরিকা ও ইউরোপের সংবাদ পত্রগুলি।

ধর্ম মহাসভা এবং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র স্বামী বিবেকানন্দের

জয়গানে মুখরিত। তাঁর ইএ য়জবি বার্তায় ভারতবাসীর অন্তরে আলোড়ন এলো। হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে উঠল বীর বিবেকানন্দের এই বিজয়ে।

উৎসব শুরু হল দিকে দিকে।

রামনদের ও খেতরির রাজা বিশেষ দরবারে প্রজাদের জানালেন বিবেকানন্দের বিজয় কাহিনী।

মাদ্রাজ ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিরাট সভায় স্বামীজীর এই সাফল্যে আলোড়ন পড়ে গেল।

আর আমাদের বাংলা দেশে কলিকাতার টাউন হলে রাজা প্যারীমোহন মুখার্জী পি, এস, আই. বাহাদুরের সভাপতিত্বে বিরাট জনসমাবেশে এক সভা হল। স্বামীজীর এই বিজয় গৌরবে ধন্য হল সারা ভারতবর্ষ।

ডাঃ বারোজ, শিকাগো ধর্ম মহাসভার সভাপতি, রাজা প্যারী-মোহন মুখার্জীকে লিখলেন—"প্রিয় মহাশয়। কলিকাতা টাউন হলের বিরাট সভার বিবরণ সহ আমাকে যে পত্র লিখেছেন তা আমি পেয়েছি। আমি এতে সাতিশয় আনন্দিত হয়েছি। শিকাগো ধর্ম মহামণ্ডলীতে আপনার বন্ধু স্বামী বিবেকানন্দ সসম্মানে গৃহীত হয়েছিলেন। তিনি বাগ্মিতাশক্তি বলে চুম্বকের আকর্ষণের ন্যায় সকলকেই আকৃষ্ট করেছিলেন, এবং স্বীয় ব্যক্তিগত প্রভাব সম্যকরূপে বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর যত্নে লোকের চিন্তা ও ধর্মানুশীলনের আগ্রহ বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতা ও আলোচনার বন্দোবস্ত হচ্ছে। আমেরিকার জনসাধারণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গভীর প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা পোষণ করছে। আমাদের বিশ্বাস যে আপনাদের সুপ্রাচীন পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হতে আমাদের অনেক বিষয় গ্রহণ করতে হবে।"

স্বামী বিবেকানন্দের এই বিজয় গানে যেন কোন এক যাদুকরী

শক্তি পেয়ে ভারতের ত্রিশ কোটি নরনারী প্রাণ পেল এক নতুন চেতনায়।

ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিবেকানন্দের জয়গানে মুখর হয়ে উঠল।

পাশ্চাত্ত্য বিজয়ে সাফল্য লাভ করেও স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ধ্যানের ভারতের কথা চিন্তা করেছেন সব সময়ই। স্বামীজীর মনের এক গভীরে ভারতের চিন্তা স্থান পেয়েছে সর্বাগ্রে।

দেশপ্রেমিক স্বাধীনতার সৈনিক স্বামী বিবেকানন্দের মূল মন্ত্র ছিল দুঃস্থ পদদলিত দেশবাসীকে উদ্ধার করে তাদের প্রতিষ্ঠিত করার বাণী।

তাঁর বাণী ছিল ধর্মের বাণী। তাঁর বাণীতে পাই বেদান্তের বাণী।

স্বামীজী ১৮৯৫ সালে ফেব্রুয়ারীতে নিউইয়র্কে ধারাবাহিক ভাবে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এর আগে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো, আইওয়াসিটি, হাইফোর্ড, বাফেলা, বোস্টন, কেম্ব্রিজ, ইণ্ডিয়ান পোলিস, ওয়াশিংটন, ব্রুকলীন প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করে বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণের কাছে গভীর শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

আমেরিকার অনেক প্রসিদ্ধ লোকই তাঁর সঙ্গে দেখা করে পৃষ্ঠপোষকতা ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁদের মধ্যে ম্যাডাম মেরী লুইস, মিসেস্ ওলিবুল, ডাঃ এলান ডে, মিস্ ওয়াল্ডো, প্রোঃ রাইট, ডাঃ ষ্ট্রীট, মাদাম কালভে, মিঃ ও মিসেস্ লেগেট, মিস্ ম্যাক্‌লাউড প্রভৃতির নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। এঁদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায় বেদান্তের প্রচার ও স্বামীজীর সঙ্গ পাওয়াতে।

পরিশ্রম ও চিন্তায় স্বামীজীকে ক্লান্ত হতে হয়েছিল। বিশ্রামের জন্য সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠল। স্বামীজীর এক শিষ্যা তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

সেণ্ট লরেন্স নদীর মধ্যস্থ থাউজেণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে স্বামীজ

এলেন। নির্জন স্থান। চারিদিকে গাছপালা রয়েছে। বিশাল নদীর বক্ষে আরও ছোট বড় অগণিত দ্বীপ আছে।

এখানে কিছুকাল থেকে আবার ফিরে এলেন নিউইয়র্কে।

আবার কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন স্বামীজী। নিউইয়র্কে থাকার সময়ে তাঁর কয়েকজন ইংরাজ বন্ধু স্বামীজীকে ইংলণ্ডে যাবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

স্বামীজী এই অনুরোধে যাবার জন্য তৈরী হলেন।

আগস্টের মাঝামাঝি যাত্রা সুরু করলেন।

ইংলণ্ডে এসেছেন বীর বিবেকানন্দ। আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে।

মহাতেজা বীর সাধককে দেখে সবাই যেন এক নতুন প্রাণ পেয়ে গেল। স্বামী বিবেকানন্দ, মিস্ মুলার ও মিঃ স্টার্ডি প্রভৃতির আমন্ত্রণে লণ্ডনে গিয়েছিলেন। সেখানকার দর্শনীয় স্থান দেখে খুশী হলেন তিনি।

দেখতে দেখতে সাড়া পড়ে গেল। ছুটে এলেন অভিজাতবর্গ ও শিক্ষিত সমাজের নরনারীরা, এমন কি ধর্ম প্রচারকরা পর্যন্ত।

সংবাদপত্রের পাতায় স্বামী বিবেকানন্দের নাম মুখর হয়ে উঠল।

ইংলণ্ডে সাড়া পড়ে গেলো—

একদা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ডে দীর্ঘকাল থেকে ধর্ম প্রচার করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁরা তাঁদের আসন পেয়েছিলেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অপূর্ব ভাষণে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন একদিনেই।

স্বামীজী তিনবার ইংলণ্ডে এসেছিলেন। আর এইখানেই বেদান্তের প্রচারে তাঁর সাফল্য এসেছিল পূর্ণরূপে।

এখান থেকেই মিস্ মুলার, জে, জে. গুড উইন, মিস্ মার্গারেট নোবেল (ভগ্নী নিবেদিতা), মিস্টার ও মিসেস্ সোভিয়াকে, স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে সেবার কাজে পেয়েছিলেন।

লণ্ডন থেকে আবার ফিরে এলেন নিউইয়র্কে। স্বামী বিবেকানন্দ সুরু করলেন গঠনমূলক কাজ।

নিউইয়র্কে স্থাপন করলেন বেদান্ত সমিতি। আসতে সুরু করল নরনারীরা। স্বামীজীর বাণী শুনবার জন্য দলে দলে ক্লাব হতে, বিশ্ববিদ্যালয় হতে আসত তারা।

পাশ্চাত্ত্যের জন্য স্বামীজীর একমাত্র কাজ হল ভারতের মহান্ সত্যকে প্রচার করা।

আমেরিকায় কাজে যখন স্বামীজী ব্যস্ত—আবার ডাক এলো ইংলণ্ড থেকে।

স্বামীজীকে সাহায্য করতে ভারতবর্ষ থেকে যাত্রা করেছেন স্বামী সারদানন্দ।

স্বামীজী আবার এলেন ইংলণ্ডে।

লণ্ডনে এসেই স্বামীজী দেখলেন সারদানন্দকে। দেখে খুশী হলেন স্বামীজী।

লণ্ডনে থাকার সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—স্বামীজী আর পণ্ডিত প্রবর ম্যাক্সমূলারের মিলন।

স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপের বৃদ্ধ অধ্যাপক পণ্ডিত প্রবর ম্যাক্সমূলারকে প্রাচীন আর্য ঋষিদের অবতার বলে সম্বোধন করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্বামীজী বললেনঃ আজকাল হাজার হাজার নরনারী রামকৃষ্ণদেবের পূজা করছে।

পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার বললেনঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজো যদি না হবে তাহলে কার হবে?

তারপর ম্যাক্সমূলার বললেনঃ আপনারা জগতের কাছে তাঁকে পরিচিত করার জন্য কী করছেন?

কথায় কথায় আরও জানালেন পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার ঠাকুর সম্বন্ধে জীবনী লিখতে চান, যদি প্রয়োজনীয় উপাদান পান।

স্বামীজী বললেন: আপনি কবে ভারতে যাবেন? যিনি আমাদের ঋষিদের চিন্তাসমূহ শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করেছেন, তিনি যদি ভারতবর্ষে আসেন, তাঁকে আমরা সাদরে বরণ করে নেব।

অধ্যাপক প্রসন্ন মনে জবাব দিলেন: তাহলে হয়তো আর ফিরব না।......

বিদায় নিয়ে এলেন স্বামীজী।

স্বামীজী ট্রেনের জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করছেন। আকাশে ঝড় বৃষ্টি সুরু হয়েছে।

সেই ঝড় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে ম্যাক্সমূলার এসে হাজির।

আশ্চর্য হয়ে গেলেন স্বামীজী!

স্বামীজী বললেন: আপনি?

স্মিত হাস্তে জবাব দিলেন স্বামীজীর দিকে তাকিয়ে পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার, বললেন: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের যোগ্যতম সাধককে দেখার সৌভাগ্য রোজ হয় না, তাই এসেছি দেখা করতে।

স্বামীজী অভিভূত হয়ে গেলেন!

ভারতের চিন্তায় স্বামীজীর সমস্ত অন্তর আলোড়িত হয়ে আছে। আজ সারা ভারত তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছে।

স্বামীজী প্রথমবার ইংলণ্ডে এসে যে সত্য প্রচার করেছিলেন, দ্বিতীয়বার এসে তাতে দিলেন মহান্ রূপ! নানাস্থানে তাঁর বাণী অমৃতের সন্ধান যোগালো। বেদ-বেদান্তের গভীরতায় মুগ্ধ হলো প্রাচ্যের মনীষীরা, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা, ভক্তপ্রাণ নরনারী, উৎসাহী নরনারীরা।

স্বামীজী এবার ফিরে আসবেন ভারতের মাটিতে।

সঙ্গে আসবেন সেভিয়ার দম্পতি ও গুডউইন। মিস্ মূলার, মিস্ নোবেলও ভারতবর্ষে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার কল্পে আসবেন স্বামীজীর সঙ্গে।

১৮৯৬ সালেয় ১৬ই ডিসেম্বর সোভিয়ার দম্পতি সহ স্বামীজী লণ্ডন ছেড়ে এলেন ইতালিতে।

রোম তাঁকে অভিভূত করেছিল।

তারপর সেখান থেকে নেপল্‌স। এখানে গুডউইন এসে মিলিত হলেন।

পাশ্চাত্ত্য দেশকে অতিক্রম করে স্বামী বিবেকানন্দ এগিয়ে চলেছেন প্রাচ্যের দিকে। তাঁর মন নানান চিন্তায় বিভোর হয়ে উঠল। সুদূর পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে কি নিয়ে গেলেন? কি দিয়ে গেলেন এই দেশকে?

১৮৯৭—১৫ই জানুয়ারী, কলোম্বোতে এলেন স্বামীজী।

জাহাজঘাট জনকোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে। জয়ের মালা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে স্বামীজীর কণ্ঠে। বেদগান শুরু হয়েছে। অগণিত ভক্তিপ্রাণা নরনারী স্বামীজীর পদ প্রান্তে লুটিয়ে পড়েছে।

সিংহলবাসীরাই স্বামীজীকে প্রথম অভ্যর্থনা করার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছিল।

এখানে স্বামীজী গুরুগম্ভীর কণ্ঠে জানালেন হাজার হাজার শ্রোতার সামনে—পুণ্যভূমি ভারত সম্বন্ধে বললেন: পূর্বে—সকল হিন্দুর মতো আমিও বিশ্বাস করতাম ভারত কর্মভূমি...আজ আমি এই সভার সম্মুখে দাঁড়িয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি—ইহা অতি সত্য—অতি সত্য! যদি পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে যাকে "পুণ্যভূমি" নামে বিশেষিত করা যেতে পারে—যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ সর্বাপেক্ষা অধিক হয়েছে—তবে নিশ্চয়ই বলতে পারি সে আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারত ভূমি···।

সিংহলে বিভিন্ন স্থানে দশ দিন থাকার পর স্বামীজী দক্ষিণ ভারত অভিমুখে যাত্রা করলেন।

মাদ্রাজে যেন আবার নতুন করে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। আসছেন বীর বিবেকানন্দ। তোড়জোড় লেগে গেছে ইতিমধ্যেই। অভ্যর্থনা সমিতির নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন জাষ্টিস সুব্রহ্মণ্য আয়ার। কি বিচিত্র সজ্জিত হল মাদ্রাজ নগরী।

এসেছেন বীর সাধক বিবেকানন্দ। সারা সহরের নরনারীরা বিপুল উৎসাহে রেলওয়ে-স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করে আছে। হাজার হাজার নরনারীর কণ্ঠে বিবেকানন্দের জয়নাদ।

স্বামীজীকে নিয়ে চলেছেন। শ্রদ্ধায় আর শুভেচ্ছায় মাদ্রাজ নগরীর নরনারীরা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে আজ। রাজপথে পুর-নারীরা পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে আরতি করছে, আর পুষ্পবৃষ্টি থেকে শুরু করে মঙ্গলধ্বনি পর্যন্ত ঠিক যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত চলছে।

বিশাল জনতার জয়ধ্বনিতে সারা নগরী যেন মুখর হয়ে উঠেছে।

মাদ্রাজে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হল। বিরাট সভা। দশহাজার লোকের সমাবেশে মুখর হয়ে উঠল এই আয়োজন।

স্বামীজী বললেন: জনসংঘের এই উদ্দীপনা আর উৎসাহ দেখে খুশি হলাম, কিন্তু এই উৎসাহকে স্থায়ী রূপ দেওয়া চাই। ভবিষ্যতে, স্বদেশের জন্য অনেক বড় বড় কাজে এইরূপ প্রজ্বলিত উৎসাহাগ্নির প্রয়োজন।

স্বামীজী ভিক্টোরিয়া হলে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের সামনে "আমার সমর নীতি" নামে যে বক্তৃতা দিলেন তাতে জনসাধারণের মনে আলোড়ন আসে।

স্বামীজী মাদ্রাজে নয় দিন ছিলেন।

দীর্ঘকাল ভারতের পল্লী-নগরে স্বামী বিবেকানন্দ ভ্রমণ করে

এইটুকু বুঝেছিলেন যে ভারতবর্ষের উন্নতি একমাত্র সেবার মধ্য দিয়েই আসতে পারে।

মাদ্রাজ থেকে ফিরে এলেন স্বামীজী কলকাতায়।

হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে "জয় রামকৃষ্ণ দেব কী জয়"— "জয় বিবেকানন্দ স্বামীজী কী জয়।"

স্বামী বিবেকানন্দকে কলিকাতা বাসীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে যে সভার আয়োজন করা হয়েছিল তাতে স্বামীজী যে বক্তৃতা দিলেন, তা শুনে সকলের প্রাণে নতুন আশার সঞ্চার হল। ভারতের বুকে এসেছে যেন নতুন চেতনা।

স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে ধ্বনিত হল :—

"মানুষ আপনার মুক্তি চেষ্টায় জগৎ-প্রপঞ্চের সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ করিতে চায়। মানুষ নিজ আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র-বন্ধু-বান্ধবের মায়া কাটাইয়া সংসার হইতে দূরে, অতিদূরে পালাইয়া যায়। চেষ্টা করে দেহগত সকল সম্বন্ধ পুরাতন সকল সংস্কার ত্যাগ করিতে, এমন কি, মানুষ নিজে যে সার্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত দেহধারী মানব, ইহাও ভুলিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহার অন্তরে অন্তরে সে সর্বদাই একটা মৃদু অস্ফুট ধ্বনি শুনিতে পায়, তাহার কর্ণে সর্বদা একটি সুর বাজিতে থাকে, কে যেন দিবারাত্র তাহার কানে কানে বলিতে থাকে"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।"

বীর সাধক সন্ন্যাসী বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ কলম্বো থেকে কলিকাতা পর্যন্ত অভিনন্দিত হলেন।

তবু তাঁর মনে শুধু একই প্রার্থনা : জননী আমি মুক্তি চাই না, তোমার সেবাই আমার জীবনের একমাত্র অবশিষ্ট কর্ম।

বীর সাধকের কণ্ঠে তাই বার বার ধ্বনিত হয়েছে জাগরণের অভয় বাণী :

জীবে দয়া করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

হিমালয়ের মতন বিরাট শক্তিমান পুরুষ বিবেকানন্দ। তাঁর সমগ্র জীবনটার উপর দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই কাজের মধ্যে দিয়েই তিনি জীবনকে খুঁজে পেয়েছেন। একদিন অশান্ত মন নিয়ে তিনি সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছিলেন, আর সেই চলাপথ ধরেই তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন সুদূর প্রাচ্য দেশে। তাঁর জীবন ও বাণী এক সঙ্গে মিশে গিয়ে সাধক ও সন্ন্যাসী, বীর ও ত্যাগী, কর্মী ও আচার্যকে একসঙ্গে আমরা পেয়েছি।

পরিশ্রান্ত ক্লান্ততার মধ্যেও তাঁর কাজের বিরাম ছিল না। বিস্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমরা অতীতের দিকে তাকালে দেখতে পাই সেখানে তিনি শুধু একজন অন্যতম—অনন্য অসাধারণ বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন: "কোন মহান্ আদর্শ পুরুষে বিশেষ অনুরাগী হইয়া তাঁহার পতাকার নিম্নে দণ্ডায়মান না হইয়া কোন জাতিই উঠিতে পারে না······রামকৃষ্ণ পরমহংসকে আমরা এইরূপ এক ধর্মবীর, এইরূপ এক আদর্শবাদীরূপে পাইয়াছি। যদি এই জাতি উঠিতে চায়, তবে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি এই নামে সকলকে মাতিতে হইবে। এই কারণে আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য, আমাদের ধর্মের উন্নতির জন্য, কর্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া এই মহান্ আধ্যাত্মিক আদর্শ তোমাদের সম্মুখে স্থাপন করিতেছি। এই রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাদের জাতির কল্যাণ ও দেশের উন্নতির জন্য, সমগ্র মানব জাতির হিতের জন্য তোমাদের হৃদয় খুলিয়া দিন, যে মহাযুগান্তর অবশ্যম্ভাবী তাহার সহায়তার জন্য তোমাদের অকপট ও দৃঢ়ব্রত করুন।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শকে ব্রত মনে করেই স্বামী বিবেকানন্দ

তাঁর কাজ করে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশগুলি জীবন্ত হয়ে প্রকাশ পেল স্বামী বিবেকানন্দের বিস্ময়কর প্রতিভায়।

আমরা দেখতে পাই দীর্ঘকাল পরিশ্রম করেও স্বামীজী ক্লান্ত হননি কোন সময়েই। কর্মযোগী বিবেকানন্দকে ভারতবর্ষ পেয়েছে তাঁর বৃহত্তর কাজের মধ্যে-ই।

স্বামীজী বলতেন : নানা দেশ ঘুরে আমার এই ধারণা হয়েছে সংঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না। তবে আমাদের মত দেশে প্রথম হতে সাধারণতন্ত্রে সংঘ তৈয়ার করা বা সাধারণ সম্মতি (ভোট) নিয়ে কাজ করাটা তত সুবিধাজনক হবে না। এদেশে শিক্ষা বিস্তারে যখন ইতর সাধারণ লোক সমধিক সহৃদয় হবে, যখন সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে চিন্তা প্রসারিত করতে শিখবে, তখন সাধারণতন্ত্র মতে সংঘের কাজ চলতে পারবে। সেইজন্য সেই সংঘের একজন dictator বা প্রধান পরিচালক চাই। সকলকে তাঁর আদর্শ মেনে নিয়ে চলতে হবে।...”

স্বামী বিবেকানন্দের এই যুক্তিপূর্ণ কথা সকলের মনে সাড়া জাগাল।

১৮৯৭ সালের ১লা মে স্বামীজীর ডাকে সন্ন্যাসীরা এলেন। বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ীতে এই সভায় বিবেকানন্দ বললেন : আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি,...এই সংঘ তাঁর নামেই প্রতিষ্ঠিত হবে।”

স্বামী বিবেকানন্দের কথায় সকলের প্রাণে এলো নতুন জোয়ার। সংঘের নাম রাখা হল : রামকৃষ্ণ প্রচার বা রামকৃষ্ণ মিশন।

স্বামীজীর দৃষ্টিতে শিক্ষা প্রসঙ্গে আমাদের মনে জাগে তাঁর মহা অমৃত বাণীর কথাই।

স্বামীজী বলতেন : “ওরা কেউ কাউকে শিখাতে পারবে না।

শিক্ষক শিখাচ্ছি মনে করেই সব মাটি করে। কি জানিস, বেদান্ত বলে—এই মানুষের ভিতরেই সব আছে, কেবল সেগুলি জানিয়ে দিতে হবে। এই মাত্র শিক্ষকের কাজ। ছেলেগুলো যাতে আপনার আপনার হাত-পা নাক-কান মুখ-চোখ ব্যবহার করে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নিতে শেখে, এইটুকু করে দিতে হবে, তা হলেই আখেরে সমস্তই সহজ হয়ে পড়বে। কিন্তু গোড়ার কথা ধর্ম। ধর্মটা যেন ভাত আর সবগুলো তরকারী। কেবল তরকারী খেয়ে হয় বদহজম, শুধু ভাতেও তাই। মেলা কতগুলো কেতাব মুখস্থ করিয়ে মনিষ্যিগুলোর মুণ্ডু বিগড়ে দিচ্ছিস।···বাপ! কি পাসের ধুম, আর দুদিন পরেই সব ঠাণ্ডা। শিখলেন কি?—না নিজেদের সব মন্দ, সাহেবদের সব ভাল। শেষে অন্ন জোটে না। এমন High education (উচ্চশিক্ষা) থাকলেই কি, আর গেলেই বা কি?"

লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই স্বামী বিবেকানন্দের এই সব বাণীর অমোঘ শক্তি প্রকাশিত হয়েছে আমাদের চিন্তায় ও কাজে।

শিক্ষার অর্থ স্বামীজীর কথায় জানা গেছে, বেদান্ত বলে, মানুষের ভিতরই সব আছে।...কেবল সেইগুলিকেই জাগিয়ে দিতে হবে।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে সেবার তাৎপর্য ও মহিমা স্বামীজী যেমন ভাবে গ্রহণ করে আমাদের সুপ্ত মনকে জাগরিত করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

"জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" এই মহান সত্য পরম সুন্দর কথাটি স্বামীজী আমাদের বার বার বলে গিয়েছেন। তাই তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে আমাদের চলার পথের নিশানা ঠিক করে নিতে হবে।

জন কল্যাণের মঙ্গল কামনায় স্বামীজী যা করেছেন তার তুলনা হয় না।

এরপর শুরু হয়েছে নতুন ইতিহাস। স্বামী বিবেকানন্দ জনকল্যাণের মঙ্গল কামনায় মঠ, মিশন, বেদান্ত সমিতি, সেবাশ্রম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করার জন্য এগিয়ে চলেছেন। তাঁর কাজে সাড়া দিল তরুণ সন্ন্যাসীর দল।

স্বামীজীর অক্লান্ত পরিশ্রমে শিষ্য ও গুরুভ্রাতারা চিন্তিত হয়ে উঠলো।

জোর করেই স্বামীজীকে পাঠিয়ে দেওয়া হল বায়ু পরিবর্তনের জন্য।

আলমোড়াতে এলেন স্বামীজী ও কয়েকজন শিষ্য।

কাজের ব্রত নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যরা এগিয়েছেন বার বার।

মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষ লেগেছে, তাদেরকে বাঁচাতে ছুটে গেলেন স্বামী অখণ্ডানন্দজী। স্বামী বিবেকানন্দ এই খবর পেয়ে স্থির থাকতে পারলেন না। কিন্তু ডাক্তাররা যেতে দিলেন না স্বামীজীকে।

স্বামীজী আলমোড়া থেকে পাঠালেন আরও শিষ্যদের।

কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মাদ্রাজে প্রচার কার্যে সাফল্য লাভ করেছেন। স্বামী অভেদানন্দ, সারদানন্দজী ইংলণ্ড ও আমেরিকার বুকে বেদান্তের প্রচার কাজ করে নতুন আলোক শিখা এনেছেন।

স্বামীজীর মনে কি বিপুল আনন্দ।

আবার কাজ।

আলমোড়া…পাঞ্জাব…কাশ্মীর…প্রভৃতি ঘুরে তিনি আবার এলেন দেরাদুনে।

ওখান থেকে দিল্লী।

তারপর এলেন আলোয়ারে।

একদিন এই আলোয়ারে অশান্ত বিবেকানন্দ পরিব্রাজক বেশে এসেছিলেন। তখন ছিলেন তিনি অপরিচিত। কিন্তু আজ বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ এসেছেন কিন্তু তিনি যেন ঠিক সেই সর্বত্যাগীর রূপ নিয়েই এসেছেন এখানে।

কী বিপুল উৎসাহ আর উদ্দীপনা শুরু হয়ে গেছে এখানে।

আলোয়ার থেকে জয়পুরে।

তারপর খেতরি যাত্রা করলেন।

খেতরির রাজা বাহাদুর থেকে শুরু করে সবাই ব্যস্ত আজ।

শুরু হল নানাবিধ অনুষ্ঠান।

১৮৯৮ সালের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি ফিরে এলেন গৌরবময় উত্তর ভারত পরিভ্রমণ শেষ করে।

পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে ফিরে আসার পরই স্বামী বিবেকানন্দ ভাগীরথী তীরে একটি মঠ তৈরী করবেন এ কথা বলছিলেন শিষ্যদের।

স্বামীজীর এই সকংল্প ও স্বপ্ন আজ সার্থক হয়েছে।

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বেলুড় গ্রামে স্থাপন করা হল 'বেলুড় মঠ'। এ যেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলন সেতু।

স্বামী বিবেকানন্দের সার্থক সৃষ্টি বেলুড় মঠ। আজ পৃথিবীর সকলের কাছে বিস্ময় হয়ে রয়েছে।

স্বামীজী ফিরে এসেছেন ভারত ভ্রমণ শেষ করেই।

আমেরিকা থেকে জয়ের টীকা নিয়ে বেদান্তের প্রচার করে ফিরে এসেছেন স্বামী সারদানন্দজী। সিংহল থেকে এসেছেন স্বামী শিবানন্দজী। দিনাজপুরের দুর্ভোগক্লিষ্ট নরনারীদের সেবা করে ফিরে এসেছেন স্বামী ত্রিগুণাতীত।

স্বামী বিবেকানন্দের স্পর্শ পেয়ে সজীব হয়ে উঠেছে সব কাজ।

দিকে দিকে আজ জয়ের ভেরী উঠেছে।

বিদেশ থেকে এসেছেন কত নবীন শিষ্য ও শিষ্যারা।

ভারতের মাটিতে পা দিয়ে সার্থক করেছেন তাঁরা তাঁদের কাজ ও চিন্তাকে।

সর্বত্যাগী স্বামী বিবেকানন্দের দীর্ঘ জীবন সাধনার মূল মন্ত্রে আমরা দেখতে পাই যে তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল এই অসহায় জাতিকে রক্ষা করা।

ফিরে এসেছেন মিস্ মার্গারেট নোবেল, ফেলে দিয়ে এসেছেন মার্গারেট সমস্ত বন্ধনকে। নতুন কাজে ব্রতীতা হয়েছেন। আমেরিকা থেকে মিসেস ওলিবুল, মিস্ ম্যাকলিয়ড্ এসেছেন ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে।

স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্রের মনোবল ও অসীম সাহসিকতা ছিল তাঁর প্রতিটি কাজের মধ্যে।

একবার যখন কলকাতায় প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়েছে অগণিত নরনারী। মৃত্যু বরণ করে নিয়েছে অনেকেই। স্বামী বিবেকানন্দ তখন দার্জিলিংএ। তাঁর কাছে এ খবর যাওয়া মাত্র তিনি ছুটে এলেন।

এসেই ডুবে গেলেন সেবার মধ্যে।

ভগিনী নিবেদিতাও এলেন। তারপর দেখতে দেখতে স্বামী বিবেকানন্দের চেষ্টায় অসহায় নরনারীরা পেল আশা।

'সেবা পরম ধর্ম' এই মূল সত্যটি উদঘাটিত করে বীর সাধক বিবেকানন্দ দেখলেন সেবার মধ্যে দিয়েই জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি পাওয়া যায়।

বিস্ময়কর মহান পুরুষের বৈচিত্র্যময় জীবনের সমস্ত ঘটনা লিখে শেষ করা যায় না।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করেও ক্লান্ত হয়নি তাঁর মন-শরীর।

তাই তাঁর কণ্ঠে যেন আমরা আজও শুনি সেই অভয় বাণী ঃ—

"এসো নব যুগের শক্তি সাধক, আশা আনন্দ উল্লাস ও অতীত গৌরবের কঙ্কাল পরিপ্লুত এই ভারত মহাশ্মশানে, নৈরাশ্যে ও উদ্বেগ আশঙ্কার এই ঘোর অমানিশার শুভলগ্নে অভিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শক্তি সাধনায় অগ্রসর হও।......

স্বামীজী বেলুড় মঠে আছেন, এ খবর পেয়েই ছুটে এলো দলে দলে কলেজের ছাত্র ও শিক্ষিতের দল।

পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে ফিরে আসার পর অমরা নাথ ও ক্ষীর-ভবানীতে কঠোর তপস্যা স্বামীজীর জীবনে এক পরম বিস্ময়কর ঘটনা।

আলমোড়াতে থাকার সময় স্বামীজী যেন অন্য এক জগতের সন্ধান পেয়েছিলেন। নির্জনতার সঙ্গে তাঁর অন্তরের মিতালী। গভীর অরণ্যে তিনি একাই ধ্যান-ধারণায় নিজেকে বিলিয়ে দিতেন। এই সময়ে খবর পেলেন গাজীপুরের বিখ্যাত সাধু পাওহারীবাবা দেহ রক্ষা করেছেন। আর সেই সঙ্গেই খবর পেলেন ভক্তপ্রাণ মিঃ গুড্উইনও দেহত্যাগ করেছেন।

গাজীপুরের পাওহারী বাবার সঙ্গে বিবেকানন্দের দেখা হয়েছিল পরিব্রাজক অবস্থায়।

পাওহারীবাবা আগে থেকেই জানতেন ঠাকুরের কথা। স্বামীজীকে দেখেই খুশি হলেন পাওহারীবাবা।

মহাতপস্বী ও জ্ঞানী পাওহারীবাবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

স্বামী বিবেকানন্দের মনের বাসনা, যোগ-শিক্ষা নিতে হবে।

পাওহারীবাবা প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এলো সেই শুভদিন।

কিন্তু কি আশ্চর্য।

স্বামীজীর মনে হলো শ্রীরামকৃষ্ণ না পাওহারীবাবা ?

আর না! আর এগোতে পারলেন না তিনি।

আলমোড়াতে থাকাকালীন স্বামীজী ছিলেন নির্জন প্রিয়তার অনুগামী। তারপর দেখা গেছে ক্ষীর ভবানীর পবিত্র প্রস্রবণ তটে। এখানে তিনি কঠোর সাধনায় নিজেকে বিলিয়ে দিলেন।

পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে ফিরে আসার পর এ ঘটনা।

স্বামীজী এই উগ্র তপস্যায় ব্রতী হলেন। স্বয়ং একমণ দুধের ক্ষীর, আতপান্ন, বাদাম ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে জগজ্জননীকে উৎসর্গ করতেন।

আর এখানকার স্থানীয় পণ্ডিতের কুমারী কন্যাকে শাস্ত্রবিধি মতে পূজা করতেন। বীরসাধক বিশ্বজয়ী বীর বিবেকানন্দের জীবনের একটি আশ্চর্য্য ঘটন্য।

একদিন প্রজ্বলিত হোমশিখার সামনে যোগাসনে বসে ধ্যানে মগ্ন হবেন বলে ঠিক করলেন। কিন্তু সহসা তিনি দেখলেন মহা-মায়ার ধ্যানে নিমগ্ন হবার আগে, সামনেই এক ভগ্ন মন্দির। বিবেকানন্দের মনে হলো, যখন এ মন্দির মুসলমানেরা ধ্বংস করেছিল, তখন কি হিন্দুগণ তাদের প্রতিরোধ করতে পারেনি ?

স্বামী বিবেকানন্দের মনে হলো, হায় আমি যদি থাকতাম, নিজের প্রাণ দিয়েও জননীর এই মন্দির রক্ষা করতাম।

দুর্জয় শক্তির অধিকারী যেন বীর সাধক। কিন্তু কি আশ্চর্য। সহসা কার কণ্ঠস্বর ? কার দৈববাণী ? যেন জগজ্জননীর কণ্ঠস্বর, তিনি বলছেন : "যদিই বা মুসলমানগণ আমার মন্দির ধ্বংস করে প্রতিমা অপবিত্র করে থাকে তাতে তোর কি ? তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি তোকে রক্ষা করি ?"

তারপর আবার যাত্রা শুরু হল পাশ্চত্ত্য দেশে।

বীর বিবেকানন্দ এর আগে ভারতকে পরিচয় করে দিয়ে এসেছিলেন সনাতন ধর্ম প্রচার করে।

সে তারিখটা ছিল ১৮৯৩ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর। সেদিন পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রইল। যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো সহরে আন্তর্জাতিক ধর্ম সম্মেলনে বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ সমস্ত আমেরিকা-বাসীকে 'ভগ্নী ও ভ্রাতৃবৃন্দ' বলে সম্বোধন করে ভারতীয় বেদান্ত শুনিয়েছিলেন।

তরুণ মনের অশান্ত বেদনায় বিবেকানন্দ একদা চেয়েছিলেন নির্বিকল্প সমাধি, তার বিনিময়ে কি পেলেন তিনি? পরমহংসদেব তাঁকে দিলেন জগৎ কল্যাণের মহান্ ব্রত।

আর সেই মহান ব্রতের কল্যাণ স্পর্শে বীর সাধক বিবেকানন্দ বেরিয়ে পড়েছিলেন পথে, ঘুরে বেড়ালেন—আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ, তারপরই আপন মহিমায় নিঃসম্বল অবস্থায় শিকাগো শহরে এসে যোগ দিলেন ধর্ম মহাসভায়।

সমস্ত বিশ্ববাসী শ্রদ্ধায় বীর বিবেকানন্দকে প্রণতি জানালো।

প্রসঙ্গত মিসেস্ এনিবেসাণ্টের মন্তব্য আমাদের মনে পড়ে, মিসেস্ এনিবেসাণ্ট বলেছিলেন :—

"মহিমাময় মূর্তি, গৈরিক বসন ভূষিত, শিকাগো সহরের ধূসর বক্ষে ভারতীয় সূর্যের মত ভাস্কর, উন্নত শির, মর্মভেদী দৃষ্টিপূর্ণ চক্ষু, চঞ্চল ওষ্ঠাধর, ধর্ম মহাসভার প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ আমার দৃষ্টিপথে এই ভাবে প্রতিভাত হয়েছিলেন। সভামঞ্চে এসে দণ্ডায়মান হলেন স্বামীজী। অপরাপর শক্তিমান ও প্রতিভাসম্পন্ন প্রতিনিধিবৃন্দ যদিও তাঁদের বার্তা সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছিলেন, কিন্তু এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাচ্য প্রচারকের অতুলনীয় আধ্যাত্মিক বার্তার মহিমার সামনে সেগুলি অবনত হতে বাধ্য হয়েছিল। তাঁর কণ্ঠোত্থিত প্রত্যেকটি ঝঙ্কার শব্দ আগ্রহান্বিত মন্ত্রমুগ্ধবৎ বিপুল জনসংঘের মানসপটে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়ে গেল।"

মিসেস্ এনিবেসাণ্টের এই কথাগুলির মধ্যে শ্রদ্ধা বিনয়েরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বীর বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য দেশে বার বার বলেছিলেন :—

"আধ্যাত্মিকতা, পবিত্রতা এবং দাক্ষিণ্য কোন বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের একচেটিয়া বস্তু নয়। বিশেষ ধর্ম সাধনায়ই মহান চরিত্র নরনারীরা আবির্ভূত হয়েছেন। তাই প্রত্যেক ধর্মের পতাকায় লেখা থাকবে যুদ্ধ নয়, সাহায্য, ধ্বংস নয়, আত্মস্থ করে নেওয়া, ভেদ নয়, দ্বন্দ্ব নয়—চাই শান্তি।"

বীর বিবেকানন্দের বজ্র ধ্বনিতে সাড়া পড়ে গিয়েছিল সারা পৃথিবীতে। সত্যের বাণী নিয়েই বীর বিবেকানন্দ গিয়েছিলেন লণ্ডনে।

আর লণ্ডনের প্রিন্সেস হলের সভায় দাঁড়িয়ে স্বামীজী বললেন :

"আমি দিব্যচক্ষে দেখছি, সমগ্র পাশ্চাত্ত্য জগৎ একটা আগ্নেয়গিরির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে তা অগ্নি উদ্‌গীরণ করে পাশ্চাত্ত্য জগৎকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। এখন যদি তোমরা সাবধান না হও, তবে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তোমাদের কলকব্জা আর ছাপাখানায় যা না হয়েছে, তার চাইতে খৃষ্ট ও বুদ্ধের কয়েকটি কথায় মানব সমাজ ঢের বেশী উপকৃত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নির্লজ্জ অনুদারতা, নিষ্ঠুর যুদ্ধ পিপাসা আর নিদারুণ অর্থলোভ।"

স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রকণ্ঠে যখন ধ্বনিত হয়েছিল এই কথাগুলি, তখন সভামধ্যে কি বিপুল উদ্দীপনা আর উত্তেজনা। আর এই সভায় আরেকজন মহিয়সী নারী ছিলেন যাঁর নাম মিস্ মার্গারেট নোবেল।

মিস্ মার্গারেট নোবেল বললেন : স্বামীজী, আমাদের সভ্যতায় আপনি শুধু দেখলেন নির্লজ্জ অনুদারতা, যুদ্ধ-লিপ্সা আর অর্থ-

লাভের লালসা। ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনা করে আশ্চাত্ত্যে কি আর কিছুই আপনার চোখে জাগল না।

বীর বিবেকানন্দ জানালেন: পড়েছে বৈকি! ভারতবর্ষ চিরকালই মানুষকে অমৃতের সন্তান বলে জেনেছে। এখানকার মানুষও সেই অমৃতের সন্তান। এ পৃথিবীতে পাপ বলে কিছু নেই, যদি থাকে মানুষকে পাপী বলাই এক ঘোরতর পাপ।

স্বামী বিবেকানন্দের অমৃতময় কণ্ঠে ধ্বনিত হল আরও তিনি বললেন: তবু রাজনীতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় আমি আপাততঃ দৃষ্টিতে মানুষকে আর বৃহত্তর ক্ষেত্রে পুণ্যাশ্রিত দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের ভারতীয় জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে তা হচ্ছে— সমগ্র জাতীয় আধ্যাত্মিক শক্তি একত্রীভূত করে যেন এক বিদ্যুৎধারে রক্ষা করা, আর যখনই সুযোগ উপস্থিত হয়, তেমনই এই সমষ্টিভূত শক্তির বন্যায় সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করা।

মিস্ মার্গারেট নোবেল বললেন: এই সমষ্টিভূত শক্তির উৎস কি একমাত্র বেদান্ত দর্শনেই আছে?

বীর বিবেকানন্দ তাঁর তেজদীপ্ত কণ্ঠে জানালেন: ভারতীয় বেদান্ত বার বার করে আত্মজয়েরই কথা বলেছে, বলেছে, "আত্মানং বিদ্ধি।"

স্বামীজীর এই মহান সত্যের বাণী পেয়ে মিস্ মার্গারেট নোবেল পেলেন সত্যের সন্ধান। এর আগে আমরা সে ঘটনার উল্লেখ করেছি।

সেদিন মিস্ মার্গারেট নোবেল অভিভূত কণ্ঠে বলেছিলেন: পেয়েছি আমি, সে ডাক আজ শুনতে পেয়েছি। এতদিন এর জন্যই অপেক্ষা করেছিলাম। এই মহান সত্যের বাণী আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে পেয়েছি স্বামীজী। আপনি আমাকে দীক্ষা দিন, আজ থেকে আপনি আমার গুরু, আর ভারতবর্ষ আমার দেশ।

লণ্ডনের কাজ শেষ হলে মার্গারেট নোবেলকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজী ফিরে এলেন ভারতবর্ষে।

উৎসাহ আর শুভেচ্ছা জানিয়ে মিস্ মার্গারেট নোবেলকে বললেন: তোমার মধ্যের সেই পূর্ণতাই তোমাকে তুমি গড়ে তুলবে। বলো, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।

আর মিস্ মার্গারেট নোবেলের কণ্ঠে একই সুর ধ্বনিত হলো। বললেন তিনি: ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।

স্বামী বিবেকানন্দ ও মার্গারেট নোবেল প্রসঙ্গে আমাদের মনে জাগে স্বামীজীর কি বিপুল দুর্জয় শক্তি যার প্রভাবে বিদেশী নারী তাঁর সমস্ত কিছুকে ফেলে দিয়ে সমাজ ও মানব কল্যাণের সেবায় উৎসর্গ করলেন নিজেকে।

কলকাতার বাগবাজারে যে বাড়ীতে একদিন তরুণ সাধক বিবেকানন্দ সাধনা করেছিলেন, সেই বাড়ীতেই মার্গারেটকে রাখার ব্যবস্থা হল।

স্বামীজী বললেন: এই বাড়ি দেখছো, আর এই বাড়িটা আমার পছন্দ। এইখান থেকেই তোমার কাজ সুরু হবে। স্কুল তৈরী করে এখানকার মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে হবে, প্রয়োজন মত রোগীদের সেবা করতে হবে। তোমার কি একটা কাজ? কোন দিন কোন একটি ছোট্ট শিশুকেও স্নেহ ও যত্ন করতে ভুলে যেও না, কারণ জানবে—একটি ছোট কীটের মধ্যেও মহত্ব লুকিয়ে থাকে।

মার্গারেট খুশী হয়ে উঠলেন, বললেন: স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় আপনি নিজে এসে আমাকে আশীর্বাদ করবেন।

স্বামীজী আশীর্বাদ করেছিলেন।

মার্গারেটকে দীক্ষা দিয়ে তাঁর নাম দিলেন নিবেদিতা।

আর ভগিনী নিবেদিতা প্রসন্ন চিত্তে সেদিন থেকে এদেশের

রোগে, শোকে, দুঃখে, ত্যাগে, সেবা, সাধনায়, স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন।

ভগিনী নিবেদিতাকে স্মরণ করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "তিনি ছিলেন লোকমাতা। মাতৃভাব পরিবারের বাহিরের একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে, তাহার মূর্তি তো ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই। এ সম্বন্ধে পুরুষের যে কর্তব্য বোধ আছে, তাহার কিছু আভাষ পাইয়াছি। কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ব বোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন our people এমন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত, আমাদের কাহারও কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না। ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালোবাসিতেন, তাহা যে দেখিয়াছে, সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে দেশের লোককে আমরা হয়ত সময় দিই, অর্থ দিই, এমন কি জীবনও দিই, কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই—তাহাকে তেমন অত্যন্ত সত্য করিয়া নিকটে করিয়া জানিবার শক্তি আমরা লাভ করি নাই।"

মহিয়সী ভগিনী নিবেদিতা চিরদিনই স্মরণীয়া হয়ে রইবেন আমাদের মধ্যে।

এর আগে আমরা উল্লেখ করেছি স্বামীজী আবার যাত্রা সুরু করেছেন পাশ্চাত্ত্য দেশে।

বীর বিবেকানন্দ ভারতকে এর আগে পরিচয় করিয়ে দিয়ে এসেছিলেন—আর এবার যাবেন স্বামী বিবেকানন্দ মানব মিত্র বন্ধু বিবেকানন্দরূপে। পাশ্চাত্ত্য দেশে নতুন প্রেরণা জোগাতে।

সঙ্গে চলেছেন ভগিনী নিবেদিতা। আর সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত মহাযোগী স্বামী তুরিয়ানন্দ।

১৮৯৯ সালের ২০শে জুন যাত্রা সুরু হয়েছিল।

স্বামীজীর এই পাশ্চাত্ত্য দেশ পরিক্রমায় আমরা দেখতে পাই তাঁর জীবন ছিল উল্কার মত, একটা অদ্ভুত শক্তি নিয়ে মানব মিত্র

স্বামী বিবেকানন্দ এগিয়ে চলেছেন। যেখানে গিয়েছেন সর্ব জাতি তাঁকে বরণ করে নিয়েছে আপন ভেবে।

ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর অমূল্য বাণীগুলিকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। 'The Master as I saw Him' নামক গ্রন্থে ভগিনী নিবেদিতা সামীজী সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

১৯০০ সালের ৯ই ডিসেম্বর স্বামীজী অপ্রত্যাশিত ভাবে বেলুড় মঠে এলেন।

স্বামীজীকে দেখতে সবাই তো অবাক। স্বামী বিবেকানন্দকে দেখতে পেয়ে সবাই যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেলো। স্বামীজী স্মিত হাস্যে বললেনঃ বাইরে থেকে খাবার ঘণ্টা শুনে ভাবলুম যে, যদি তাড়াতাড়ি না যাই, তা হলে রাত্রে খেতে পাব না, তাই পাঁচিল টপকে এলাম।

মায়াবতী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন স্বামীজী!

শরীর অসুস্থ, তবুও তাঁকে যেতে হবে।

১৯০১ সালের ৩রা জানুয়ারী মায়াবতী মঠে ফিরে এলেন।

স্বামীজী কথায় কথায় বললেনঃ "সত্যিই আমার দেহ ভেঙে পড়েছে......"

স্বামীজী বেশী দিন ছিলেন না এখানে। এখানকার পরিবেশ স্বামীজীকে তৃপ্তি দিয়েছিল, হিমালয়ের কোলে নীরব এই জনতার কোলাহল যেখানে নেই সেই মায়াবতীর মঠে তাঁর থাকার ইচ্ছা ছিল।

কিন্তু পারলেন না স্বামীজী। দুরন্ত হাঁপানী রোগে তার শরীর হয়ে গিয়েছিল দুর্বল। তবুও তিনি কোন ব্যাপারেই নিজের কথা ভাবেননি।

মায়াবতী থেকে ফিরে আসার পর স্বামীজী ঢাকা আর আসামে যাবার জন্য তৈরী হলেন।

শরীর অসুস্থ, পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত, তবুও বীর সাধক স্বামীজীর কাজের শেষ নেই।

পূর্ববঙ্গ আসাম ভ্রমণ শেষ করে আবার ফিরে এলেন স্বামীজী।

বেলুড় মঠ……

ভাগীরথীর তীরে, সাধনার পুণ্য তীর্থ!

বীর সাধকের শরীর অসুস্থ, ক্লান্ত। তবুও কাজের শেষ নেই… আসতেন নরনারীরা। স্বামীজী কথা বলতেন। দেশ সেবা, সমাজ, ইত্যাদি নিয়ে। স্বাস্থ্য খারাপের আশংকায় সবাই ব্যস্ত।

কিন্তু অটল নির্ভিক পুরুষ বললেন: "রেখে দে তোদের নিয়ম-ফিয়ম…এদের মধ্যে যদি একজনও ঠিক ঠিক আদর্শ জীবন যাপন করতে পারে, তা হলে আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হবে।…চুপ করে ঘরের দোর বন্ধ করে থেকে বাঁচতে আমি চাই না। কত কষ্ট করে দূর থেকে যারা আসে আমার কাছে…আমি তাদের ফেরাব কি করে বল?

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে বিশ্রাম বলে কিছু ছিল না। তাই তাঁর জীবনসাধনার ব্রত ছিলো কাজ আর কাজ।

কাজের মধ্য দিয়েই আমরা দেখেছি স্বামীজীকে নানা ভাবে নানা দিক দিয়ে।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে তাঁর কর্মময় জীবনের বিচিত্র গতির ক্রমবিকাশের আলোচনা করতে গেলে আমরা দেখতে পাই স্বামীজী ছিলেন কর্মযোগী মহাপুরুষ।

তাই তাঁর জীবনের শেষ দশবৎসর যে অদ্ভুত কাজের পরিচয় দিয়েছেন তা বলে শেষ করা যায় না। তাঁর এই বিরাট কাজের মাধ্যমে শুধু ভারতবর্ষ নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর বিজয়

বার্তা ঘোষিত হয়েছে। কী করে তা সম্ভব? উৎস সন্ধান করলে আমরা দেখতে পাব তাঁর গুরু পরম করুণাময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবন বেদের পরিসমাপ্তি ঘটেছে তাঁর জীবন ও কাজের মাধ্যমেই।

স্বামী বিবেকানন্দের এই কর্মময় প্রেরণার ইতিহাসের পরম সত্য আধ্যাত্মবাদের মধ্যে।

তাই তাঁকে আমরা দেখেছি পরিব্রাজকের বেশে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করে কাজের কথা বলেছেন, গেয়েছেন জাগরণের গান। তাঁর এই ভ্রমণের মাধ্যমেই তিনি দেখেছেন যুগ যুগান্তের চিরন্তন শাশ্বত বাণী। অনুভব করেছিলেন শোষিত দারিদ্র্য-পীড়িত দেশবাসীর মর্মবেদনা। আর সেই ভারত ভ্রমণের মাধ্যমেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন ভারতেতিহাসের সারমর্ম, যার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর নানা প্রবন্ধে, আলোচনায় পত্রাবলী ও বক্তৃতার মধ্যে।

স্বামী বিবেকানন্দের বিস্ময়কর জীবনের দিন লিপিগুলি দেখলে আমরা দেখতে পাই তাঁর ধ্যান নেত্রের সামনে প্রকাশিত হয়েছে ভুবনমোহিনী স্বদেশ জননী, উন্মোচিত হয়েছে পরাধীনতার জ্বালার বেদনাময় বাণী।

স্বামীজী বলেছেন—"আমার দেশের দীন-দরিদ্র অভাগা ছেলেরা, ঘোর অন্ধকারে ওরা ডুবে রয়েছে। এমনি শোচনীয় অবস্থা ওদের যে, ধনীর হাতে লাঞ্ছনা ভুগতে ওদের জন্ম এই ওদের ধারণা।...... আমি একটা সমাধানের কথা অনেক দিন ধরে ভাবছি, "পর্বত যদি মহম্মদের কাছে না আসে, মহম্মদই যাবেন পর্বতের কাছে।" গরীব ছেলেরা যদি স্কুলে না আসতে পারে, স্কুলই যাবে তাদের কাছে...... মাঠে, কারখানায় সব জায়গায়...।"

স্বামীজীর এই কথার মধ্যে আমরা খুঁজে পাই ভারতের দরিদ্র, মূর্খ, পরাধীন নির্য্যাতিত জনসাধারণের শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে তাঁর আকুলতা।

স্বামীজী বলতেন : "কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা। ইউরোপের হু নগর পর্যটন করে তাদের দরিদ্রের সুখ স্বাচ্ছন্দ ও বিদ্যা দেখে মামাদের গরীবদের কথা মনে পড়ে অশ্রুজল বিসর্জন করতুম। কন এ পার্থক্য হলো?—শিক্ষা, জবাব পেলুম।

শিক্ষা বলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয় বলে—অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জগে উঠেছে। আর আমাদের ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন।

নিউইয়র্কে দেখতুম, আইরিশ উপনিবেশবাসী আসছে—ইংরেজ-দ নিপীড়িত বিগতশ্রী, হৃত সর্বশ্রী, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ—সম্বল কটি লাঠি ও তার অগ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলি। ার চলন সভয়, তার চাউনি সভয়। দু মাস পড়ে আর এক দৃশ্য—স সোজা হয়ে চলেছে, তার বেশভূষা বদলে গেছে, তার চাউনিতে, ার চলনে আর সেই 'ভয় ভয়' ভাব নেই। কেন এমন হল? ামার বেদান্ত বলছেন যে, ঐ আইরিশম্যানকে তার স্বদেশে ারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল, সমস্ত প্রকৃতি একবাক্যে লেছিল, "প্যাট তোর আশা নেই, তুই জন্মেছিস গোলাম, াকবি গোলাম।" আজন্ম শুনতে শুনতে প্যাট-এর তাই বিশ্বাস লো, নিজেকে প্যাট হিপনোটাইজ করলে যে সে অতি নীচ। ার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামবামাত্র ারদিক থেকে ধ্বনি উঠলো, "প্যাট, তুইও মানুষ, আমরাও মানুষ। ানুষেই তো সব করছে, তোর আমার মত মানুষ সব করতে পারে, বুকে সাহস বাঁধ।"

স্বামী বিবেকানন্দের অমৃত বাণীর দিকে আমরা যতবার ফিরে তাকাব, তত বারই মনের মধ্যে ফিরে পাব সত্যসাধনার সংকেত। পৃথিবীর কোন মনীষীর মধ্যে এমন তেজদীপ্ত বাণী আমরা দেখিনি।

তাই আমরা দেখেছি পরাধীন ভারতবর্ষের বুকে তাঁর বাণীতে

প্রেরণা যুগিয়েছিল স্বদেশ-সেবায় জীবনকে উৎসর্গ করার মোহন মন্ত্র।

প্রসঙ্গত তার কয়েকটি উল্লেখ করছি:

স্বামী বিবেকানন্দ গভীর মর্মবেদনায় বলেছেন: "মাতঃ আমি নাম যশ দ্বারা কি করিব যখন আমার জন্মভূমিকে অসীম দারিদ্র্যের অতলে নিমজ্জিত হইতে দেখিতেছি! ওহো, আমরা দরিদ্র ভারতবাসীরা কি দারুণ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী একমুষ্টি অন্নের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, আর এ দেশের (আমেরিকার) লোকেরা ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছে। কে ভারতের ক্ষুধার্ত্ত জনসাধারণের মুখে অন্ন যোগাইবে, কে তাহাদিগকে এ হীন অবস্থা হইতে উত্থিত করিবে? মাতঃ, কি প্রকারে আমি তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারি তাহা আমাকে দেখাইয়া দাও।"

বীর সাধক বিবেকানন্দের অন্তর সংগোপনে কেঁদে উঠেছিল বার বার, পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করার জন্যই পাশ্চাত্ত্য দেশে গিয়েছিলেন তিনি।

তাই তাঁর বাণীতেই আমরা পাই, তিনি বলেছিলেন: "এখন আমি সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া আসিলাম, কিন্তু হায়, এ দেশের জনসাধারণের ভীষণ দারিদ্র্য ও শোচনীয় অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আমি কীরূপ ব্যথিত, মর্মাহত হইয়াছি তা কি বলিব! চক্ষুর অশ্রুধারা রুদ্ধ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ইহাদের দারিদ্র্য ও যন্ত্রণা দূরীভূত না করিয়া ইহাদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করা বৃথা প্রয়াস মাত্র এই কারণেই ভারতের দীন দরিদ্র জনসাধারণের মুক্তির উপায় নির্ধারণের জন্যই আমি আমেরিকা যাইতেছি।"

জাতীয় জাগরণে স্বামী বিবেকানন্দ মাতৃভূমিকে বন্দনা করে তাঁর বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন: "এই সেই প্রাচীন দেশ, ভারতবর্ষ

যেখানে ব্রহ্মবিদ্যা অন্য কোন দেশে প্রবেশ করিবার পূর্বে স্বীয় বাসভবন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এদেশের আধ্যাত্মিকতার মন্দাকিনী জড় জগতে, একদিকে বিশাল নদনদী রূপে সবেগে প্রবাহিত হইয়া ভারত মহাসাগরের সহিত মিলিত, একীভূত হইয়াছে এবং অপরদিকে তুষার কিরীটী অনাদি অনন্ত হিমালয় মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া উর্ধ্ব হইতে উর্ধ্বতর সোপানে আরোহণ পূর্বক যেন সুরলোকের রহস্য-সমূহের অন্তর্দেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। এই ভারতের মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠ মহর্ষিগণের পাদস্পর্শে পবিত্র হইয়াছে। এই দেশেই সর্বপ্রথম মানব প্রকৃতি এবং অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছিল।……এই দেশেই ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ আদর্শসমূহ চরম উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। এই ভারতবর্ষ হইতেই আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বন্যার তরঙ্গভঙ্গের ন্যায় সমগ্র পৃথিবী বারংবার প্লাবিত করিয়াছে। আর ধ্বংসাভিমুখী জাতি-সমূহের ভিতর জীবন ও তেজ সঞ্চার করিবার জন্য এই ভারত হইতেই পুনরায় সেই ব্রহ্মবিদ্যার প্রবল প্রবাহ সমুত্থিত হইবে। এই ভারতই শত শত শতাব্দীর আঘাত, বৈদেশিক আক্রমণ, শত শত রীতিনীতি—বিপর্যয় সহ্য করিয়া অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে… এদেশের জীবন আত্মারই মত অনাদি, অনন্ত, অমর, আমরা এমনি দেশের সন্তান।

হে ভারত সন্তানগণ, তোমাদিগকে কতকগুলি কাজের কথা বলিবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি। এ দেশের অতীত গৌরবের কথা তোমাদিগকে যে উদ্দেশ্যে স্মরণ করাইয়া দিতেছি তাহা এই—লোকে আমাকে অনেকবার বলিয়াছে, অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা বৃথা, বরং তাহাতে অবনতি হইয়া থাকে। অতএব আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে ভবিষ্যতের দিকে। একথা সত্য। কিন্তু অতীতের গর্ভ হইতেই ভবিষ্যতের জন্ম হয়। অতএব অতীতের দিকে যতদূর পার দৃষ্টিপাত কর, পশ্চাতে যে অনন্ত

নির্ঝরিণী প্রবাহিতা তাহা হইতে জ্ঞান-বারি আকণ্ঠ পান কর; তারপর সম্মুখ দিকে অগ্রসর হও; ভারতবর্ষ অতীত কালে যত মহান, যত গৌরবান্বিত, যত মহিমান্বিত ছিল, তাহাকে তদপেক্ষা মহীয়ান, অধিকতর জ্যোতিষ্মান কর। আমাদের পূর্বপুরুষগণ মহাপুরুষ ছিলেন, ইহা আমাদিগকে জানিতে হইবে, তদ্দ্বারা অতীত যুগে যে সকল মহৎ কার্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে বিশ্বাস করিতে হইবে, তারপর সেই বিশ্বাস এবং অতীত মহত্ত্বানুভবের বলে অতীত ভারত অপেক্ষা বৃহত্তর, মহত্তর ভারত গড়িয়া তুলিতে হইবে।

বীর সাধক বিবেকানন্দ ভারতের নরনারীদের মহান আদর্শে ব্রতী করে তোলার জন্য তাঁর জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন সেবা ও কর্মের মাধ্যমেই। বন্ধন মুক্তির সাধনায় তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল "বন্ধন খোল, বন্ধন খোল, বন্ধন খোল। আপনার বন্ধন খোল, অপরের বন্ধন খোল। আপনি বন্ধন মুক্ত হও, অপরকে বন্ধনমুক্ত কর।"

স্বামীজী বলতেন: "মুক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভাল মন্দ উভয়ের বন্ধন থেকেই মুক্ত হওয়া। লোহার শিকলও শিকল, সোনার শিকলও শিকল।"

বীর সাধক স্বামী বিবেকানন্দ—তাঁর এই মহৎ আদর্শকে কাজে পরিণত করার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

স্বামীজী বলেছেন: "প্রথমতঃ কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন—যারা নিজেদের সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হবে।"

সর্বত্যাগী সাধক স্বামীজী বার বার এই কথাই স্মরণ করিয়ে দিতেন: "নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? মুক্তি কামনাও তো মহাস্বার্থপরতা।"

এই পৃথিবীর স্বার্থ সংঘাতে যখন মানুষের মন বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে তখন দেখা যায় মহান পুরুষের আদর্শই আমাদের চলার

পথের পাথেয়। আমাদের ভারতবর্ষের আত্মার আত্মীয়—সর্বত্যাগী সাধক বিবেকানন্দ বার বার বলেছিলেন: "তোমরা সব ছুড়িয়া ফেলিয়া দাও, এমন কি নিজেদের মুক্তি পর্যন্ত দূরে ফেলিয়া দাও—যাও অপরের সাহায্য কর।......যদি এই জাতি জীবিত থাকে, তবে তুমি আমি, আমার মত হাজার লোক যদি অনশনে মরে, তাতেই বা ক্ষতি কি?

স্মরণ করি স্বামীজীর সেই পুণ্য বাণী, এই ভারতবর্ষ আমার দেশ এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:—

"আমার জন্মভূমির মত দেশ আর কোথায় আছে? যে কোন ব্যক্তি, তিনি ভারতবাসী হউন, অথবা বিদেশী হউন, যদি তাহার আত্মা পশুত্বে পরিণত না হইয়া থাকে—এই পুণ্যভূমিতে দণ্ডায়মান হন—তিনিই নিজেকে জীবনপ্রদ চিন্তারাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত বলিয়া অনুভব করেন—যে সকল চিন্তা মানবেতিহাসের অজ্ঞাত সহস্র সহস্র শতাব্দী যাবৎ নরকুল শ্রেষ্ঠ পুণ্যাত্মা ভারতীয় মহাপুরুষগণ মনুষ্যজাতিকে পশুত্ব হইতে দেবত্বে উন্নীত করিবার জন্য উদ্ভাবিত করিতেছেন। এদেশের পবন আধ্যাত্মিকতার স্পন্দনে তরঙ্গায়িত। এদেশে দর্শনশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং আধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অনুশীলন ও উদ্ভাবনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে...... জীবনের অবিশ্রাম ও সংগ্রামের মধ্যে মানুষকে শান্তির আশ্রয় দিবার জন্য এবং যে শিক্ষার ফলে মানুষ তাহার পশুত্বের বাহ্য পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া অজয় অমর অনন্ত আনন্দ স্বরূপ আত্মারূপে প্রকাশিত হয়, সেই শিক্ষা দিবার জন্য এই ভারতই আত্মনিয়োগ করিয়াছে।...এই ভারতবর্ষেই সর্বপ্রথম ভোগ বিলাসের ক্রোড়ে লালিত, সামাজিক গৌরব-গরিমার দীর্ঘদেশে আরূঢ়, অশেষ প্রতাপের নব যৌবনের প্রারম্ভে সকল মায়ার শৃংখল ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।...আমাদের এই মাতৃভূমিতেই জীবন মৃত্যুর সমস্যা, সর্বদুঃখের মূল বাসনার তীব্র দহন হইতে

মানবের মুক্তি সমস্যার সর্বপ্রথম মীমাংসিত হইয়াছিল, এবং তাহা এইরূপ ভাবে হইয়াছিল যে, জগতের অপর কোন দেশ সেরূপ মীমাংসায় এ-পর্যন্ত উপনীত হইতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও পারিবে না।……আমার এই মাতৃভূমিই একমাত্র দেশ যেখানে ধর্ম জীবন্ত সত্য বলিয়া গৃহীত এবং প্রাত্যহিক জীবনে আচরিত হইয়াছে, যেখানে নরনারী জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য দুর্জয় সাহসে সমাধি গর্ভে মগ্ন হইয়াছে।……কেবল এদেশেই মানবাত্মা সমগ্র বিশ্বের একত্ব অখণ্ডত্ব উপলব্ধি করিয়া বিশ্বচরাচরের হৃৎস্পন্দন আপন হৃদয়ের স্পন্দন বলিয়া অনুভব করিয়াছে।”

স্বামীজীর অভয় অমর বাণীর মধ্যেই আমরা খুঁজে পাই সত্যিকারের পথ চলার নিশানা।

১৯০২ সালের জানুয়ারী মাসে স্বামীজী বুদ্ধ গয়াতে গিয়েছিলেন।

এই তাঁর জীবনের শেষ ভ্রমণ।

পবিত্র পুণ্যময় বোধিদ্রুমমূলে একদা তীব্র তাড়নায় বালক নরেন্দ্রনাথ এসেছিলেন সত্যের সন্ধানে।

সংগ্রামের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সেই অশান্ত নরেন্দ্রনাথ ফিরে এসেছিলেন বারবার স্বার্থ সংঘাতের জগতের কাছ থেকে।

সেদিনের সেই অশান্ত মনের সমস্ত জ্বালা পরম সত্যের মহান বাণীর কাছে নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলেন, পরম করুণাময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে।

কিন্তু আজ?

পবিত্র পুণ্যময় বোধিদ্রুম মূলে ধ্যানমগ্ন স্বামী বিবেকানন্দ।

বুদ্ধ গয়া মঠের মোহন্ত মহারাজ স্বামীজীকে নিয়ে এসেছেন অতিথিরূপে।

তারপর কাশী থেকে ফিরে এলেন স্বামীজী।

আবার বেলুড় মঠে ফিরে এসেছেন স্বামীজী। কিন্তু মঠে এসে তাঁর রোগ বৃদ্ধি হল।

স্বামীজী শয্যা গ্রহণ করলেন।

বীর সাধক শয্যায় শায়িত।

এদিকে চলেছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—সমস্ত আনন্দে পরিপূর্ণ···মঠের বিশাল প্রাঙ্গণ জনপূর্ণ।

স্বামীজীর রোগ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বুঝতে পারলেন যেন সব তিনি। শিষ্যদের ডেকে বললেনঃ "কি ভাবছিস, শরীরটা জন্মেছে, আবার চলে যাবে······

১৯০২ সালের ৩রা জুলাই······

সেদিন ছিল একাদশীর দিন।

বেলুড়ে এসেছেন ভগিনী নিবেদিতা। স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করবেন।

স্বামীজীর ছিল সেদিন উপবাস। তাঁর ইচ্ছে হলো—ভগিনী নিবেদিতাকে তিনি নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়াবেন।

স্বামীজী বললেনঃ "আজ আমার একাদশীর উপবাস; কিন্তু তা বলে তুমি এখান থেকে না খেয়ে যেতে পারছো না নিবেদিতা, বস আমি তোমার খাবার ব্যবস্থা করছি।"

স্বামীজীর কথা শুনে নিবেদিতা বাধা দিয়ে বললেন: "কি দরকার, আমিও না হয় উপোস করব।"

স্বামীজী একথা শুনে নিবেদিতাকে বললেন: /না, না, তুমি কেন মিছেমিছি উপোস করে কষ্ট পাবে। এস, আমি তোমার হাত ধুয়ে দিই, তারপর নিজের হাতে তোমাকে খাইয়ে দিই।"

নিবেদিতা বললেন: "কী বলছেন স্বামীজী? এ কাজ তো আপনার সাজে না স্বামীজী, এ কাজ তো আপনাকেই আমার করা কর্তব্য।"

স্বামীজী তা শুনলেন না।

তাঁর মানস কন্যা ভগিনী নিবেদিতাকে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়ে বললেন: জানো যীশুখ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন, আমি আর কতটুকু করতে পারলাম।

নিবেদিতা বললেন: আর কিছু বলবো না আমি, শুধু পা দুখানি বাড়িয়ে দিন আমি প্রণাম করে যাই।

এমনি করেই দিন কাটলো সেদিন।

অমরনাথ আর ক্ষীরভবানীর মন্দির থেকে ফিরে আসার পর স্বামীজী যেন আরেক জগতে চলে গিয়েছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন: "ও-যেদিন নিজেকে চিনতে পারবে, সেদিন আর দেহ থাকবে না।"

পবিত্র পুণ্য তীর্থ বেলুড় মঠ।

সাধনার তীর্থভূমিতে মহামানবের সাগর তীরে দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন আত্মমগ্ন সাধক বিবেকানন্দ...

১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই।

খুব ভোরে উঠেছেন তিনি।

আজ আর ধ্যানে বসলেন না। গল্প করলেন। স্বামীজীকে দেখে শিষ্যেরা অবাক হয়ে গেলেন।

কিন্তু কেউ বুঝতে পারলেন না আর এক বৃহত্তর জগতের ডাকে তিনি প্রস্তুত হয়েছে।

স্বামীজী বললেন ঃ কালীপূজো করতে হবে রে ?

সেই সময়ই সুপণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এলেন !

কথা হল।

স্বামীজীর কী আনন্দ মনে।

স্বামীজী পূজোর আয়োজন করতে বললেন।

তারপর ঠাকুর ঘরে গেলেন। ঘরে গিয়ে ঠাকুর ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে দিলেন।

আশ্চর্য !

তিন ঘণ্টা পরে ফিরে এলেন স্বামীজী।

কণ্ঠে তাঁর সংগীত।

দূরে দাঁড়িয়ে আছেন স্বামী প্রেমানন্দজী।

মহাযোগী সাধক স্বামী বিবেকানন্দ অস্থির ভাবে পায়চারী করছেন।

স্বামী প্রেমানন্দজী দেখছেন স্বামীজীকে !

স্বামীজী বলছেন আপন মনঃ "যদি এখন আর একজন বিবেকানন্দ থাকত, তা হলে সে বুঝতে পারত, বিবেকানন্দ কি করেছেন ! কালে অনেক বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করবে।

চমকে উঠলেন স্বামী প্রেমানন্দজী ! কি শুনলেন তিনি ?

খাবারের সময় ঠাকুর ঘরে নীচের তলায় স্বামীজী সকলের সঙ্গে খেতে গেলেন।

খেতে খেতে বললেন ঃ তাঁর শরীর আগের চেয়ে অনেক ভালো।

সদা হাস্যময় সাধক বিবেকানন্দকে একসঙ্গে পেয়ে ভক্তরা মুগ্ধ হয়ে উঠল।

স্বামীজীর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন একজন ব্রহ্মচারী।

মঠের বাইরে বের হলেন দু'জনে।

স্বামীজী বেলুড় বাজার পর্যন্ত ভ্রমণ করে ফিরে এলেন।

মঠের বারান্দায় বসে আছেন বীর সাধক বিবেকানন্দ।

সন্ধ্যা হয়েছে…আরতির সময় হয়ে এসেছে…।

স্বামীজী ধীরে ধীরে বারান্দা থেকে উঠে এলেন।

নিজের ঘরে গেলেন।

তাঁর সঙ্গে রয়েছেন একজন ব্রহ্মচারী।

ঘরে সমস্ত দরজা জানালা খুলে রাখা হয়েছে।

বাইরের ঘন অন্ধকার…ভাগীরথীর বক্ষে কী অপূর্ব আলোক প্রতিবিম্ব…তারা জ্বলছে…আকাশে অগণিত নক্ষত্র রয়েছে, সব নীরব।

স্বামীজী ধীরে ধীরে জানালার কাছে এগিয়ে এলেন।

স্বামীজী পূব দিকের জানালার দিকে চেয়ে দেখছেন দক্ষিণেশ্বরের দিকে।

আত্মমগ্ন ধ্যানমগ্ন স্বামীজী…কী দেখছেন বার বার?

দক্ষিণেশ্বর…

একদিকে তাঁর জীবনের স্বপ্ন…

আরেক দিকে তাঁর সাধনা।

দুই মহামিলনের সার্থক সৃষ্টি বেলুড় মঠ।

পুণ্য পবিত্র ভাগীরথীর তীরের দিকে চেয়ে কি দেখছিলেন সাধক বীরেন্দ্র বিবেকানন্দ? দেখছিলেন সমস্ত জীবন সাধনার রহস্যাবৃত এখনই হয়ত উন্মোচিত হবে ভাব সমাধির তীরে?

তাই বা কে জানে? কে জানে? কর্মশ্রান্ত সাধক সন্ন্যাসীর অন্তরে কিসের যন্ত্রণা? কিসের মাধুর্যে আজ সে আত্মমগ্ন?

ধীরে ধীরে ফিরে এলেন জানালা থেকে।

রাত হয়ে এসেছে।

স্বামীজী বললেন ব্রহ্মচারীকে: বাইরে গিয়ে জপ কর।

ব্রহ্মচারী বাইরে চলে গেলেন।

বীর সাধক আত্মমগ্ন হয়ে রইলেন ধ্যানে!

স্বামী বিবেকানন্দ জপমালা হাতে পদ্মাসনে বসলেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বিরাম নেই। কোন মহাসমুদ্রের পারে তাঁর মন চলে গিয়েছে।

ব্রহ্মচারী ঘরে এসে স্বামীজীকে বাতাস করতে লাগলেন।

মহাদেবের মত অটল, স্থির পর্বতের মত অটল মহাপুরুষ যোগী সাধক বিবেকানন্দের দেহ মন স্থির। নিশ্চল। জপমালা হাতে নিয়ে।

ব্রহ্মচারী বিস্ময় দৃষ্টি নিয়ে নীরবে তাকিয়ে রয়েছেন।

রাত্রি প্রায় ৯টা।

স্বামীজীর হাত কেঁপে উঠল...মনে হল শিশুর মত কান্না তাঁর স্বরে। দীর্ঘশ্বাস! আর সেই ধ্যানমগ্ন অবস্থায় স্বামীজীর মাথা হেলে পড়েছে।

মহাযোগী বিবেকানন্দের এই অপূর্ব মহান দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে ব্রহ্মচারী নীচে চলে গেলো সকলকে খবর দিতে।

কী হয়েছে স্বামীজীর? কোন্ মহান্ তীর্থে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে? কে জানে এই অনন্ত কালস্রোতে ক্ষণিক জীবনের মধ্য দিয়েই স্বামী বিবেকানন্দ দিয়ে গেলেন উত্তাল একটা ঝড়ের সংকেত। যে ঝড়ের সংকেতে সারা পৃথিবীর আবার জন্ম হবে নতুন ভাবে।

তারপর?

যোগীবর মহাবিবেকানন্দ অনন্ত নিদ্রায় শায়িত।

স্বামী বিবেকানন্দ অমর লোকে চলে গেছেন। তাঁর কর্মক্লান্ত দেহ চির বিশ্রামে স্থির।

যুগ থেকে যুগে, কাল থেকে কালে স্বামী বিবেকানন্দ অমর হয়ে রইবেন মানুষের মনে।

তাঁর মহান কাজের আদর্শকে গ্রহণ করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে সত্য সাধনার পথে। তাঁর বাণী আমাদের অন্ধকার মনে সন্ধান দেবে নতুন আলোর।

বীর সাধক স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্যময় জীবন গাঁথার শেষ কি করে হয় তা আমার জানা নেই।

এ গ্রন্থ শুধু তাঁরই শ্রদ্ধার দীনতম পুষ্পাঞ্জলি।